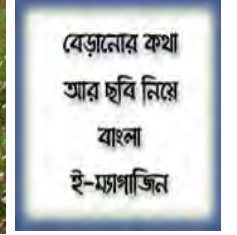


৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা - মাঘ ১৪২০

আমাদের
ছুটি



অন্নপূর্ণা পর্বতারোহণের পথে দেখা ধৌলাগিরি শৃঙ্গ - আলোকচিত্রী- শ্রী দেবশিস বিশ্বাস



আমাদের বাংলা

আমাদের দেশ

আমাদের পৃথিবী

আমাদের কথা

□ ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা - মাঘ ১৪২০ □

বেশ কিছুদিন ধরে জাতীয় গ্রন্থাগারে বসে পুরোনো বই ঘাঁটছিলাম। হাতে এল বাংলা ভ্রমণ কাহিনির একেবারে প্রথমদিককার কিছু লেখা, কয়েকটি বই। দেখলাম বাংলাসাহিত্যে ভ্রমণকাহিনির ইতিহাস খুব পুরোনো নয়। আসলে পায়ের তলায় সর্ষে এই প্রবাদবাক্য কিন্তু আধুনিক বাঙালিকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে। প্রাচীনকালে বাণিজ্য অথবা যুদ্ধযাত্রা, পরবর্তী পর্বে ধর্মপ্রচারের মত খুব প্রয়োজন না হলে বাঙালি বেরোতনা। স্বাভাবিকভাবেই সেই বেরোনোর অনুষ্ণে সত্যিকার ভ্রমণকাহিনি লেখা সম্ভব ছিল না, হয়ওনি। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাঙালি যখন তীর্থের উদ্দেশ্যে বেরোতে শুরু করল তখন থেকে ভ্রমণকাহিনি রচনার শুরু হয়। অবশ্য নিছক তীর্থভ্রমণ ছাড়াও সেই ভ্রমণের রাজনৈতিক তথা অন্যান্য বৃহৎ উদ্দেশ্যও ছিল। লেখার মাধ্যমও তখন গদ্য ছিলনা, কাব্যেই কাহিনি লেখা হত। বাংলা ভ্রমণ গদ্যসাহিত্যের জন্ম নিতে আরও প্রায় একশো বছর লেগেছিল।

প্রথমদিককার বইগুলোর মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য তিনটি হল বিজয়রাম সেনের 'তীর্থমঙ্গল'(১৭৭০), জয়নারায়ণ ঘোষালের 'কাশী-পরিভ্রমণ'(১৮০৯) এবং যদুনাথ সর্ক্বাধিকারীর লেখা 'তীর্থভ্রমণ' ১৮৫৩-১৮৫৭ সালে (১২৬০-৬৪ বঙ্গাব্দ)। রচনার কালক্রম হিসেবে এগুলিই বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের প্রথম তিনটি গ্রন্থ। প্রথম দুটি পুঁথি কাব্যে লেখা হলেও তীর্থভ্রমণ গদ্যে রচিত হয় যদুনাথের ডায়েরির পাতায়। ১৮০০ সালে শ্রীরামপুরে বাংলা হরফে মুদ্রণ শুরু হলেও তীর্থমঙ্গল ও কাশী-পরিভ্রমণ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে এবং যদুনাথের গ্রন্থটি ১৯১৫ সালে। পুস্তকাকারে মুদ্রিত হতে অনেক দেরি হওয়ার জন্য খুব স্বাভাবিকভাবেই এই বইগুলির কোন প্রভাব ঊনবিংশ শতকের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালির ওপরে পড়েনি। কিন্তু সংবাদ প্রভাকরে ঈশ্বর গুপ্তের পত্রাকারে লিখিত ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনির (১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ/১২৫৭ বঙ্গাব্দ) প্রকাশের ঠিক পরে পরেই আমরা দেখতে পাই সেই সময়ের সাময়িক পত্রিকাগুলিতেও ভ্রমণ কাহিনি প্রকাশের চল শুরু হয়। বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের বিকাশে তো বটেই 'ঘরকুনো' বাঙালির বেড়াতে বেরোনোর মানসিকতা গড়ে তোলাতেও 'বামাবোধিনী', 'ভারতী', 'নব্যভারত', 'মুকুল', 'সখা', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ'-র মত পত্রিকাগুলি একটা বড়সময় ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ছোট-বড়দের বিভিন্ন সাময়িকীর পাশাপাশি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হতে শুরু করে বাঙালির লেখা দেশবিদেশের নানা ভ্রমণ কাহিনিও। অন্যান্য লেখালেখির পাশাপাশি ভ্রমণ কাহিনি লিখতে কলম তুলে নিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ। আবার মূলতঃ ভ্রমণ লেখার হাত ধরেই বাংলা সাহিত্যে পাকাপাকি আসন করে নিলেন জলধর সেন, শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী, কৃষ্ণভাবিনী, প্রসন্নময়ীরা। বেড়ানোর মতই বই পড়ার আদতও বাঙালির চেনা সখ - তা ছাপা হোক বা ই-বুক। পুরোনো এই ভ্রমণ কাহিনিগুলির নস্টালজিয়া তাতে এনে দেয় একটা অন্যরকম আমেজ। আজকের ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি লেখক-পাঠকেরা অনেকেই শতাব্দী প্রাচীন সেইসব লেখাগুলি পড়ার সুযোগ পাননি। 'আমাদের ছুটি'-র পাঠকদের জন্য এবার থেকে পুরোনো পত্রিকার পাতা থেকে অথবা পুরোনো বইয়ের কিছু কিছু নির্বাচিত অংশ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে পত্রিকার পাতায়। নতুন বছরে এটাই আমাদের পুরোনো উপহার।

২০১৪ ভালো কাটুক সবার - ভ্রমণে আর মনভ্রমণে।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায় -



"যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস্ যখন বোম্বায়ে আগমন করেন তখন তাঁহার সম্মানার্থে এলিফান্টা দ্বীপে এক ভোজ দেওয়া হয় সেই উপলক্ষে গুহাভ্যন্তর দীপালোকে সুন্দর রূপে রঞ্জিত হইয়াছিল। মন্দ নয়। শৈবমন্দিরে স্নেহ ভোজ - না জানি দেবদেবীগণ কি ভাবে এই অঘোরকৃত্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন!"

- এলিফান্টা গুহা ভ্রমণের স্মৃতিকথা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলমে

□ আরশিনগর □

শুশুনিয়াকথা - শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ



সাইকেলে দেশ দেখি - মহম্মদ শরীফুল ইসলাম

□ সব পেয়েছির দেশ □

স্থিতিধরের শিখর ছুঁয়ে - দেবজিৎ ভৌমিক



ইতিহাসের তীর্থভূমি অমৃতসর - অদिति ভট্টাচার্য্য

যেখানে ঢেউ ওঠে লবণ হুদে - সুমিতা সরকার



□ ভুবনডাঙা □



পাহাড়চূড়ার আতঙ্কের শেষে - দেবশিস বিশ্বাস

সুন্দরী নায়েগ্রা - সুচেতনা মুখোপাধ্যায় চক্রবর্তী



□ শেষ পাতা □

প্রবারণা পূর্ণিমার রাতে - জিয়াউল হক শোভন

অপরূপা সোমেশ্বরী - মার্জিয়া লিপি

জোনাকি পোকাক দেশে - রফিকুল ইসলাম সাগর





= 'আমাদের ছুটি' বাংলা

বেড়ানোর মতই বইপড়ার আদতও বাঙালির চেনা সখ - তা ছাড়া হোক বা ই-বুক। পুরোনো এই ভ্রমণ কাহিনিগুলির নষ্টালজিয়া তাতে এনে দেয় একটা অনারকম আমেজ। আজকের ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি লেখক-পাঠকেরা অনেকেই শতাব্দী প্রাচীন সেইসব লেখাগুলি পড়ার সুযোগ পাননি। 'আমাদের ছুটি'-র পাঠকদের জন্য এবার পুরোনো পত্রিকার পাতা থেকে অথবা পুরোনো বইয়ের কিছু কিছু নির্বাচিত অংশ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে পত্রিকার পাতায়।



কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের অন্যতম ব্যক্তিত্ব লেখক, সঙ্গীতস্রষ্টা ও ভাষাবিদ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩) ছিলেন দ্বারকানাথের পৌত্র, দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ। তিনি প্রথম ভারতীয় হিসেবে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। ঊনবিংশ শতকে বাংলার নারীমুক্তি আন্দোলনেও সত্যেন্দ্রনাথ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দু স্কুলের ছাত্র হিসেবে ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৮৫৯ সালে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। এই বছরই সত্যেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র সেন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সিংহল (শ্রীলঙ্কা) ভ্রমণ করেন। ১৮৬২ সালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বন্ধু মনমোহন ঘোষের সঙ্গে ইংল্যান্ডের পাড়ি দেন। ১৮৬৩ সালে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে নির্বাচিত হন। পরের বছর দেশে ফিরে এসে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে কাজে নিযুক্ত হন। বদলি চাকরির সূত্রে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেন। সত্যেন্দ্রনাথ বাল গঙ্গাধর তিলকের গীতারহস্য ও তুকারামের কবিতাবলি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর অন্যান্য রচনাগুলি হল - সুশীলা ও বীরসিংহ (নোটক, ১৮৬৭), বোম্বাই চিত্র (১৮৮৮), নবরত্নমালা, স্ত্রীস্বাধীনতা, বৌদ্ধধর্ম (১৯০১), আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস (১৯১৫), ভারতবর্ষীয় ইংরেজ (১৯০৮), রাজা রামমোহন রায়। তাঁর লেখা ভ্রমণ কাহিনিগুলি ধারাবাহিকভাবে 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত হত।

এলিফান্টা

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

যিনি বোম্বায়ে বেড়াইতে আসিয়াছেন তিনি গজদ্বীপ (এলিফান্টা) না দেখিয়া যেন বাড়ী না ফেরেন। এলিফান্টার অপর নাম ঘরপুর্নী। এই দ্বীপে যে সকল গুহামন্দির আছে তাহা প্রস্তরময় পাহাড় খুদিয়া নির্মিত। চতুর্মন্দিরের মধ্যে একটাই প্রধান তাহাই বিশেষ দ্রষ্টব্য। আপলো বন্দর হইতে স্ত্রীমারে করিয়া এলিফান্টা দ্বীপ একঘন্টায় যাওয়া যায়। বন্দর বোটে করিয়া গেলে আর একটু বেশী সময় লাগে। এই রকম একটা বোটে অনুকূল বায়ুভরে পাল তুলিয়া যাওয়াতে আরাম বটে কিন্তু বাতাস বন্ধ ও শ্রোত প্রতিকূল হইলে বোটে যাওয়া আসা অনেক ঘন্টার ধাক্কা। যাত্রীদের সুবিধার জন্য বড় বড় পাথর ফেলিয়া সমুদ্রতীর হইতে গুহামুখ পর্যন্ত এক সোপান পথ প্রস্তুত কিন্তু ভাটার সময় নৌকা কাছে যেসিতে পারে না - তীর হইতে অনেক দূরে রাখিতে হয়। নামিবার স্থানে পূর্বকালে একটা হস্তীর বিশাল পাষণ প্রতিমূর্তি ছিল তাহা হইতেই পোর্টুগীস লোকেরা এই দ্বীপের নামকরণ করিয়াছে। দ্বীপে এই প্রতিমূর্তির চিহ্নমাত্রও এইক্ষণে দৃষ্ট হয় না, তাহার ভগ্নাবশিষ্ট পিণ্ড বিস্তারিয়া উদ্যানে উঠাইয়া রাখা হইয়াছে। সোপানপরম্পরা হইতে উপরে উঠিয়া গুহামন্দিরের সম্মুখ প্রাঙ্গণে উপনীত হওয়া যায়। তথা হইতে কয়েক ধাপ উচ্চে উঠিলে সম্মুখে সুনীল সমুদ্র, সমুদ্রের ক্রোড়ে কশাই দ্বীপ ও দূরে অর্গবপোতপূর্ণ বোম্বাই বন্দর পর্যন্ত অতি মনোহর সুন্দর দৃশ্য আবিষ্কৃত হয়। গুহার প্রবেশ দ্বারটি বেশ বড় ও সারি সারি চারি থাক স্তম্ভের মধ্য দিয়া প্রধান মন্দিরে প্রবেশ করা যায়। এই সকল স্তম্ভ প্রকাণ্ড প্রস্তরময় ছাদ-ভার বহন করিতেছে। স্তম্ভের সংখ্যা ছোট বড় মিলিয়া দ্বাচত্বারিংশৎ। তাহার কয়েকটি ভগ্নদশাপন্ন। মন্দিরের প্রবেশ দ্বার হইতে শেষ পর্যন্ত প্রায় ১৩০ ফীট দীর্ঘ ও পূর্বদ্বার হইতে পশ্চিম দ্বার পর্যন্ত ততটা প্রস্ত।



এই মন্দির এইক্ষণে নিত্যনিয়মিত পূজার কার্যে ব্যবহৃত হয় না - যবনদের দৌরাত্ম্যে অনেক কাল পরিত্যক্ত হইয়াছে। তথাপি কোন কোন শৈব উৎসবে তথায় হিন্দুযাত্রী সমাগত দেখা যায় ও শিবরাত্রির সময় এক হিন্দুমেলা প্রবর্তিত হয়। এলিফান্টা যে শৈব মন্দির এই মেলার প্রচলনই তাহার প্রমাণ কিন্তু তাহার আরো সুস্পষ্ট প্রমাণ মন্দিরের অভ্যন্তরেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার মধ্যে যে সকল খোদিত মূর্তি বিদ্যমান তাহার অধিকাংশ শৈব মূর্তি। মন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র এই সকল পাষণ মূর্তি 'আধো আলো আধো ছায়া'র মধ্য হইতে দৃষ্টি পথে পতিত হয়। চতুর্দারবিশিষ্ট একটা প্রকোষ্ঠে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এই প্রকোষ্ঠের বাহিরের চারিদিকে দ্বারপালগণ পিশাচের উপর ভর দিয়া দগ্ধায়মান। উত্তর দিক হইতে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের ত্রিমূর্তি দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মার গস্তীর প্রশান্ত মূর্তি বিষ্ণু ও মহাদেবের মধ্যে বিরাজিত। তাঁহার এক হস্তে সন্ন্যাসীর পান পাত্র। বক্ষের অলঙ্কারের শিল্পনৈপুণ্য প্রশংসনীয়। ব্রহ্মার বামে বিষ্ণু দক্ষিণ হস্তে প্রস্ফুটিত

পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন; দক্ষিণে মহেশ্বর - তাঁহার হাস্যদৃষ্টি করহিত ফণীফণার উপর নিপতিত। নরকপাল ও বিল্বপত্র তাঁহার শিরোভূষণ।

ত্রিমূর্তির দক্ষিণে অর্দ্ধনারীশ্বর। বামার্দ্ধ গৌরী ও দক্ষিণার্দ্ধ মহাদেবের মূর্তি। মহাদেবের চারি হস্তের এক হস্ত নন্দী শৃঙ্গোপরি স্থাপিত। এই মূর্তির দক্ষিণে হংসবাহন চতুর্মুখ ব্রহ্মা এবং বামে গরুড়বাহন বিষ্ণু। গরুড় এইক্ষেণে ছিন্ন মস্তক। উপরিভাগে ও পশ্চাতে অন্যান্য দেব দেবর্ষিগণ বিরাজ করিতেছে। ইন্দ্রদেব ঐরাবত পৃষ্ঠে আসীন।

ত্রিমূর্তির বামে হরপার্বতীর বিশাল মূর্তিদ্বয়। হরশির হইতে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী অভ্যুদিত। মহাদেব দণ্ডায়মান - তাঁহার বাহ চতুষ্টিয়ের এক বাহু জনৈক পিশাচের উপর স্থাপিত তাহার ভারে যেন সে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। শিবের দক্ষিণে তাঁহার অন্যান্য অনুচরগণ, তদুপরি ব্রহ্মা ও শিবের মাঝে ঐরাবত-বাহন ইন্দ্র। পার্বতী শিবের দিকে ঝুঁকিয়া এক পিশাচীর উপর বাম হস্তে ভর দিয়া আছেন, তদুপরি গরুড়াসীন বিষ্ণু। সর্বোপরি ছয়টি মূর্তি তাহার দুইটি নারী অন্যগুলি নরমূর্তি।

ত্রিমূর্তির আরো একটু বামস্থিত পশ্চিম প্রকোষ্ঠে হরপার্বতীর বিবাহ সভায় উপনীত হইবে। একজন পুরোহিত লজ্জাশীলা বধুকে আণ্ড বাড়াইয়া দিতেছেন।

অপর দিকের প্রকোষ্ঠে গণেশ জন্মের অভিনয়। হরপার্বতী কৈলাস পর্বতে একাসনে উপবিষ্ট - আকাশ হইতে তাহাদের উপর দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন। পার্বতীর পশ্চাতে একটি বামা একটি শিশু কোলে করিয়া আছে।

দক্ষিণ হইতে উত্তর মুখে ফিরিয়া অন্য প্রকোষ্ঠে দেখিবে রাবণ কৈলাস পর্বত সরাইয়া লঙ্কায় লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। কৈলাস অতিদূরে অবস্থিত বলিয়া রাবণের শিব-পূজার ব্যাঘাত হয় তাই তাহা উঠাইয়া নিজ পুরীতে লইয়া যাইবার চেষ্টা। এদিকে কৈলাস পর্বত কম্পমান দেখিয়া পার্বতী ভয়ে জড়সড়। মহাদেব তাঁহার পদাঙ্গুলি দ্বারা রাবণের শিরোপরি পর্বত এমন জোরে চাপিয়া ধরিলেন যে, তাহার তলে দশানন দশসহস্র বৎসর চাপা পড়িয়া থাকেন অবশেষে ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্যা আসিয়া তাঁহার উদ্ধার করেন।

ইহা হইতে পশ্চিম দিকের প্রকোষ্ঠে গমন করিলে দক্ষযজ্ঞ বৃত্তান্ত খোদিত দেখা যায়। অষ্টভুজ কপালমাল রুদ্রমূর্তি বীরভদ্র দক্ষনিধনে নিযুক্ত - তাঁহার উপরিস্থিত একলিঙ্গের চতুর্দিকে উপবিষ্ট দেবগণ হত্যাকাণ্ড সভয়ে দর্শন করিতেছেন। এই লিঙ্গের উপর একটি আকার আছে কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে তাহা ওঁ কার প্রতিপাদক চিহ্ন।

আরো কতক পা চলিয়া গেলে প্রবেশদ্বারের কাছাকাছি মহাদেবের অষ্টভুজ ভৈরব মূর্তি ও যোগাসনস্থিত মহাযোগী এই মূর্তিদ্বয় দৃষ্ট হইবে।

এই সকল খোদিত মূর্তি কল্পনা-যানে আমাদিগকে দেবসভায় উপনীত করে। কোথাও দ্বারপালগণ যষ্টিহস্তে পিশাচ সঙ্গে দণ্ডায়মান - কোথাও হর-পার্বতীর বিবাহোৎসব - কোথাও তাহাদের কৈলাসে ঘরকন্না - কোথাও মহাদেব ভূতগণ সাথে তাম্ব নৃত্যে উন্মত্ত - কোথাও তিনি রুদ্রমূর্তি কপালভৃৎ - কোথাও বা ধ্যানমগ্ন মহাযোগী - কোন স্থানে দেখিবে কমলবাহন ব্রহ্মা - কোন স্থানে শঙ্খচক্রধারী বিষ্ণু - কোথাও ঐরাবতপৃষ্ঠে ইন্দ্রদেব, গণেশ, কার্তিক, কামদেব - তিলকধারী জটায়ু, কৈলাসশিখরতলে রাবণ - কোথাও গঙ্গা লক্ষ্মী সরস্বতী মূর্তিমতী। দুঃখের বিষয় যে খোদিত মূর্তি সকল প্রায় সকল বিকলাঙ্গ অথবা সম্পূর্ণ রূপে অঙ্গহীন। কালের হস্তে এই মন্দির ততটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই - দুর্দান্ত মুসলমানদের অত্যাচারেও ইহার অনিষ্টসাধন হয় নাই - ইহার যে এই দুর্দশা পাশ্চাত্য যবন দানবের উৎপীড়নই তাহার কারণ। এই মন্দির পূর্ণ যৌবনে যে কি সুন্দর ছিল তাহার চিত্র কল্পনাতেই রহিয়া যায়।

এলিফান্টার জনাকাল নির্ণয় করা সহজ নহে। ইহার প্রবেশ পথে যে শিলালেখ্য ছিল তাহা পোর্টুগীস রাজাজ্যে লিসবনে প্রেরিত হয় - সে সময়ে সে লেখা পাঠ করিয়া কেহই অর্থ করিতে পারে নাই। ইহা এই মন্দিরের প্রাচীনত্বের এক প্রমাণ। সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া ইহার বয়ঃক্রম সহস্র বৎসর অবধারিত করা যাইতে পারে।

রাত্রিতে এই গুহামন্দির আলোকিত হইলে সুন্দর দেখায়। যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস্ যখন বোম্বায়ে আগমন করেন তখন তাহার সম্মানার্থে এলিফান্টা দ্বীপে এক ভোজ দেওয়া হয় সেই উপলক্ষে গুহাভ্যন্তর দীপালোকে সুন্দর রূপে রঞ্জিত হইয়াছিল। মন্দ নয়। শৈবমন্দিরে স্নেহ ভোজ - না জানি দেবদেবীগণ কি ভাবে এই অধোরক্ত্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন!

[লেখাটি সত্যেন্দ্রনাথের 'বোম্বাই চিত্র' বইটি থেকে নেওয়া হয়েছে। অত্রতে কিছু কিছু বাংলা বানান টাইপের অসুবিধাটুকু বাদ দিলে মূল বানান ও বিন্যাস অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। - সম্পাদক]





= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আ. জাল ত্রমপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল =

শুশুনিয়াকথা

শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ

শুশুনিয়ার তথ্য

(১)

যেখানে ছিলাম তার ঠিক পেছনের দিকটায় একটা পাহাড় উঠে গিয়েছে ঢেউ খেলানো মালভূমির জমি ফুঁড়ে। সারা গায়ে তার গাছের পোশাক, সবুজ আর সবুজ। তার মাথার উপর দিয়ে সীমানাহীন একটা আকাশ খুলে আছে, খুব লঘু হয়ে যেন। দেখতে চেয়েছে আমাদের খেলাধুলো। যখন যেমন আমরা বদলাচ্ছি সেও বদলাচ্ছে তার মেজাজ। ভোরের ঘুম জড়ানো ভার কাটিয়ে দিনের মধ্যে প্রথমে হয়ে উঠছে। তার ঘুমের আলস্যর পাশ দিয়ে ছেলেমেয়েরা হেঁটে গিয়েছে পাহাড়ের চূড়ায়। বেশ কিছুটা নিয়মিত পায়ে চলার পথের হালকা খাড়াই একটা সময় তীব্র হয়েছিল। বেড়েছে দিনের রোদও। নামার পথে অনেকের বুক কেঁপেছে। একটু এদিক ওদিক হলেই ঠিকরে একেবারে নীচে। বন্ধু কেমন যেন শত্রু হয়ে উঠছে! চেনা কেমন অচেনা হয়ে উঠছে। তবু তাকে পেরিয়েই নেমে আসা। সকালের জলখাবারের শেষে নাট্য মহড়ার শুরু। একদল মহড়ায়। অন্যদল অন্যান্য আয়োজনে ব্যস্ত। রোদ তীব্র হতে হতে হঠাৎ ভারী মুখ নিয়ে বসে পড়লো খেবড়ে আকাশজুড়ে, মেঘ হয়ে। আমরা কেন তাকে দেখছি না এমন এক শিশুর অভিমানে। আমরা শুধুই ব্যস্ত আমাদের কাজ নিয়ে। তখন মুখ ফেরাতেই হয়। মহড়ার পালা শেষ করে নেমে পড়তে হয় জলে। জলের মধ্যে এসে পড়েছে পাহাড়ের ছায়া। মাথার উপরে টাঙানো আকাশ তার সঙ্গে কে বড় কে বড় খেলছে। আমরা জলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত সাঁতারে, ডুবে, খেলায়। সময় ঘুড়ির মত ভেঁ-কাট্টা হয়ে যাচ্ছিল আর কী! তখন, ঠিক তখন খিদে, আদিম খিদে জানিয়ে দেয় তার অস্তিত্ব আমাদের।

জল ছেড়ে জলপিপিনা ছেড়ে আমরা খাবার ঘরে। ভাত, ডাল, আলুসেদ্ধ মাখা, পোস্তর বড়া। পাশে স্যালাড, লঙ্কা আর বিটনুন। শেষ করার জন্য হাপিত্যেস করে আছে ডিমের ঝোল। পোস্তর স্বাদ জিত ছাড়াতে না ছাড়াতেই তার ঝাঁপ। একটু আটকে যেতে হয়। কেমন একটা বালি উঠে আসে প্রত্যেক গরমে। বালি কেন খাবারে? ভাতে নেই, ডালে ছিল না তত, তাহলে ডিমের ঝোলে কেন? রহস্যটা পরিষ্কার হল ফেরার দিন রাতে। হবুদ ক্ষেত থেকে তুলে তার তৈয়ারি হয়। বালিমাটির বালি মিশে যায় সেই হলুদে। তার কিছু উঠে আসে আমাদের মুখে। আপনমনেই মুচকি হাসি। তিনদিনে আমার খেতে কী অস্বস্তি, আর এই খেয়েই চলছে এখানে বছরগুলো। বিকেল গড়িয়ে আসে। খোলা মাঠের মধ্যে আমরা নেমে পড়ি। সকাল থেকে চিতি সাপের আনাগোণা চলছে সেখান দিয়ে। বিষ আছে। কামড়ালে সাত থেকে বারো ঘন্টার মধ্যে হাড়ের গাঁটগুলো ও পাকস্থলীতে দারুণ ব্যথা শুরু হবে। সঙ্গে পেট কামড়ানোও। তো, তার মধ্যে যদি অ্যান্টি ভেনাম না জোটে তাহলে...!

বাগানের আশেপাশে খানিক দাপিয়ে নিয়ে শুরু হয়ে যায় বৈদিক একটা নাট্যের অংশপাঠ ও প্রশিক্ষণ। ঋগবেদের নাট্যাংশ এটি। যাঁরা তখন কাজটা করতেন তাঁদের তো অরণ্যের মধ্যকার আশ্রমেই করতে হত। সাপ কী সিংহ তা নিয়ে খুব বিলাসিতার সুযোগ ছিল না। ধীরে ধীরে বেদের হান্দস আর তার বাংলা অর্থ বোঝার পালার মধ্যেই সূর্য লাল হয়ে ওঠে। তার এবারে যাবার সময়। সঙ্গে নেমে আসে বনবাংলার আশেপাশে। মঞ্জীর গাড়ি, এস এল আর-ধারী দেহরক্ষী, উর্দি পরা বনবিভাগের কর্মচারী, অনতিদূরের স্পঞ্জ আয়রন কারখানার অবিশ্বাস্য দূষণ, আশেপাশের একটি বর্ষিষ্ণু আর অন্য সব হত দরিদ্র অথচ সুন্দর পরিচ্ছন্ন গ্রামগুলোর মাথার উপরে কালো রং ঐক্যে দেয় কেউ যেন। সব সমান, সবাই সমান!

সব সমান? সবাই সমান? আমরা বলি। আধুনিক ও প্রগতিশীল আমরা বলি। সঙ্গোপনে সকলে মানি না। প্রকাশ্যে কেউ কেউ মানেন না। সে সব থাক! যা মানা না মানার বাইরে তা হল মানুষ অন্যান্য জন্তুদের মতনই একটি জন্তু। তার মানুষ বলে যে স্বপরিচয় তা অর্জন করতে হয়। সে অর্জন তো একদিনে সম্ভব না। অনিচ্ছতেও সম্ভব না। ইচ্ছেতেই আমরা এমন কর্মশিবির সাজিয়েছি। সেখানেও মাপকাঠি থাকে। থাকবেই। কে কতদূর 'আমিত' আর 'মনুষ্যত্ব'-র ফারাক রেখাটি টানবে। তাই কিছু ঠিক হবে, কিছু ভুল হবেই। ভুলগুলোকে বুঝে তাকে পেরোলে, ঠিকের সংখ্যা কিছু বাড়ে। এবং আজ যা ঠিক তা কালকের

ভুলে পরিণত হবে সে কথাটাও কিছুটা বোঝা যায়। বোঝার জন্য আমরা একটা নাট্যানুষ্ঠান করবো। রাত্রে। গভীর, গহীন রাত্রে। পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্যে প্রাথমিক অর্জনগুলোকে সম্বল করে করবো। তার আগে সঙ্কর মহড়া চলবে অন্য একটি প্রসেনিয়াম প্রয়োজনার। রাত ঘনাক, আমরা ফিরে আসবো আমাদের শুশুনিয়া কথায়। বাকী অর্জন আর বাকী শিক্ষা নিয়ে ফিরে আসবো।

(২)

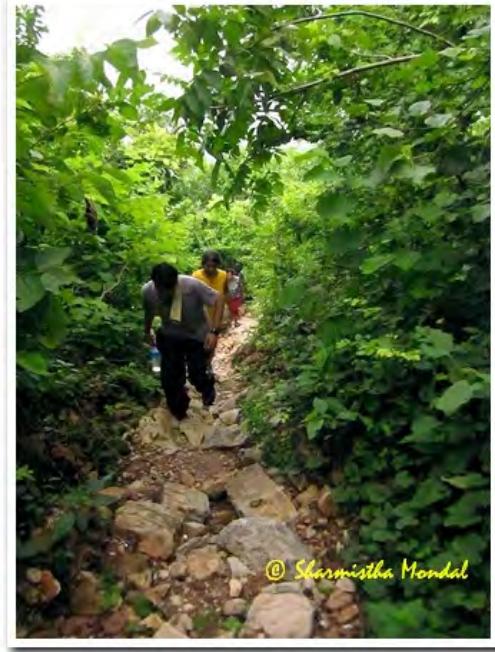
থিয়েট্রিক্স-সেপার এবারের ওয়ার্কশপ শুশুনিয়া পাহাড়ে। বাঁকুড়া স্টেশনে যখন নামলাম তখন ভোর হবে হবে করছিল। গাড়ি নিয়ে একপ্রস্থ দরাদরি করে রওনা হওয়ার পর থেকেই আমাদের চিন্তা-চেতনায় ছিল শুশুনিয়া আর সামনের দিনকালগুলো। রাস্তাজুড়ে ছিল কাশের সারি। শরত সাজতে বসেছিল আমাদের জন্য। যে সম্পদ সে পথে পথে ছড়িয়ে রেখেছিল সেই সম্পদ কুড়িয়ে নিতে নিতে কেউ কেউ যাচ্ছিল। কেউ তখনো মগ্ন মাথার ভেতরের ফেলে আসা শহরের

অভ্যাসে। এই করতে করতেই এক সময়ে পৌঁছে গেছিলাম বন বাংলায়। পাহাড়ে গেলো কেউ কেউ, কেউ চলে গেল মহুয়া আর হাঁড়িয়ার খোঁজে। সামনের শুশুনিয়া গ্রামের থেকে এসেছিলেন আমাদের এক বন্ধু। পর্বতারোহী তিনি। পার্থ কর্মকার। সেই বন্ধুটি আমাদের আঞ্চলিক গাইড ও সহযোগী হয়ে উঠলেন। তাঁর নিবাস যে গ্রামে সেই গ্রামটি পাথরের কাজের জন্য ভারতবর্ষে বিখ্যাত। সে গ্রামের ৯০% মানুষ পাথরের মূর্তি তৈরী করেই জীবিকানির্বাহ করেন। মূলত সে সমস্ত মূর্তি হিন্দু দেবদেবীর। বেশ কিছু শিল্পী আছেন যাঁরা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত। ঘুরে এসেছি তাঁদের কর্মশালাও। উপার্জন বেশ ভালই হয়েছে তাঁদের।



অন্যান্য গ্রামগুলির তুলনায় ওখানকার গ্রামে পাকা বাড়ির সংখ্যা অনেক বেশি। কম করেও ৮০% বাড়িই পাকা এবং দোতলা-তিনতলা বাড়ি বেশ সংখ্যায় রয়েছে। আগে শুশুনিয়ার থেকে আনা পাথরে তাঁরা মূর্তি বানাতেন। কিন্তু এখন সেখান থেকে পাথর আনা আইনত দণ্ডনীয়। তবু কি পাথর আসে না? আইনী পথে রাজস্থান থেকেও আসে মার্বেল পাথর। কিন্তু শুশুনিয়ার থেকেও আসে। বনবাংলোর গা ঘেঁষে যে পাহাড় উঠে গিয়েছে তার নীচের বিলটির কথা বলেছিলাম। সেই বিলের ঠিক পেছন দিয়েই চলে গিয়েছে সরু একচিলতে জঙ্গল পথ। দু পাশের জঙ্গলে ঢাকা থাকে বলে প্রায় দেখা যায় না। সেই পথ দিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠে যান স্থানীয় শ্রমিকরা। তাঁরা হাতুড়ি আর ছেনি দিয়ে পাথর কাটেন। যখন যেমন লাগে। কখনো ছোট পাথর, যা দু জনে বয়ে আনা যায়। কখনো এক পাথরে গড়া বড় মূর্তির জন্য বিরাট পাথর, বয়ে নিয়ে আসেন আট-দশজনে। নিঃশব্দে কাজটা হয়ে যায়।

এর আরেকটা দিকও আছে। দিকটা হল ধর্মের। শুশুনিয়া গ্রাম সংলগ্ন অঞ্চলে ধর্মীয় বিধিনিষেধ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। পাহাড়ের ঠিক নীচেই পাহাড়ের মাটি ফুঁড়ে উঠে এসেছে একটি প্রস্রবণ। ভূস্তরের নীচ থেকে আসা সেই প্রস্রবণের জল নানা খনিজে সমৃদ্ধ। সে জল পান করলে হজম সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যা মিটে যায়। যাই খাওয়া যাক না কেন তা হজম করিয়ে দেবার মতন ক্ষমতা এই জল রাখে। সে কারণে অঞ্চলের লোকেরা এই জলকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করে থাকে। সেখানে ধীরে ধীরে মন্দিরও গড়ে উঠেছে। তার সেবায়েতও রয়েছে। প্রতি শনি বা রবিবার সেখানে বেশ একটা বড় ভীড় হয়। কখনো কখনো পনেরো-বিশ হাজার লোকেরও সমাগম হয়। জেলা উন্নয়ন সমিতি জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে প্রতি বোতল জল পিছু দুটাকা করে নিলেও অঞ্চলের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য সাধারণের ব্যবহার্য শৌচালয় বা অরণ্য অঞ্চলকে ঠিকভাবে পরিষ্কার রাখার কাজে চিরকালই গাফিলতি দেখাচ্ছে। আবার ঠিক উল্টোদিকেই রয়েছে মাংস সংক্রান্ত নানা নিষেধাজ্ঞা। শূঁয়ারের বা গরুর মাংস নিয়ে বেশ একটা ট্যাবু দারুণভাবে প্রচলিত সেখানে। রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুপ্রবেশও বেশ দেখার মতন। হিন্দুত্বের অ্যাডভেঞ্চারি ওখানে হোটেল মালিক, পাথরের মূর্তি গড়ার কারিগরদের যোগসাজশে বেশ বিস্তৃত হয়েছে। যাঁরা দেবদেবীর মূর্তি বানান তাঁদের দেবভক্তি বজায় রাখার দায় আছে। যাঁরা হোটেল চালান তাঁদের দায় আছে প্রতি শনি-রবিবারের যে জল নিয়ে মেলা হয় সেই মেলাকে চালিয়ে রাখার। দুপক্ষই এখানে উপকৃত। সুতরাং বিধান বেশ কড়া। আর সেই বিধানের চাপে পিষ্ট হচ্ছেন দলিত মানুষজন। নাচ-কাঠির এক শিল্পী অত্যন্ত কৃষ্ণার সঙ্গে জানালেন তাঁরা এখনো প্রায় জল-অচল। সরকারের একশো দিনের কাজের প্রকল্পের সুবাদে কোনো রকমে কাজ পেয়ে টিকে আছেন সেখানে। কিন্তু স্থায়ী হবার সম্ভাবনা বেশ কম। আর তাঁদের অনুষ্ঠানও কমে গিয়েছে। যেমন নাকি মূলবাসীদের শিকার উৎসব ঘিরে শুরু হয়েছে অসংখ্য কড়াকড়ি। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন যাতে তারা না ভাঙে তার জন্য পুলিশ পাহারায় পাহাড় ঘিরে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে শিকার উৎসবের দিনে। বুনো শূঁয়ার, কখনো কখনো দাঁতাল হাতি, কালভদ্রে চিতা, বনরুই, নানা পাখির প্রজাতি এখনো রয়েছে পাহাড় ও তার পাদদেশে। মূলবাসীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও তাঁদের গ্রাম সভার দখল নেই। সুতরাং অরণ্যের অধিকার আইনের ব্যবহার তাঁরা করতে পারছেন না। শিকার যেমন তাঁরা করতেন তেমনই অরণ্য ও পশু সংরক্ষণও তাঁদের মাধ্যমেই বহু অরণ্যে বেশ ভালই ঘটেছে। গোটা পৃথিবীজুড়েই এই পরীক্ষা অনেক বেশী সাফল্য পেয়েছে পুলিশ পাহারার চেয়েও। তবু ওখানে এখনো তার প্রয়োগ তেমন করে শুরু হয়নি বলেই দেখে এলাম। এই ধর্ম, অরণ্য সম্পদের দখল এবং মানুষের অধিকারকে মাথায় রেখেই যাবার পথেই আমরা প্রয়োজনার বিষয় নির্বাচন করেছিলাম। বেদ মানেই শুধু ধর্মাচরণ না, বেদ মানে এক সামাজিক ইতিহাসও বটে, দলিলও ঋগবেদের যম-যমী সূক্তটি দেব-দেবীর আখ্যান বিহীন এক সাধারণ মানুষের কথা, যা তার কামনা-বাসনা-সম্পদের চলন ও সমাজ গঠনের পরম্পরার দলিল।



(৩)

এখানে আসার পথে ভাবছিলাম ধর্ম নিয়ে। মানুষের, মানে হোমো স্যাপিয়েন্স আর নিয়নডারথালের ডি এন এ তো আলাদা হয়ে গিয়েছে ৫ লক্ষ বছর আগে। হোমো স্যাপিয়েন্স কথাটা ল্যাটিনে 'বিবেচক মানুষ' অর্থ। তো সেই বিবেচক মানুষ ধর্মের বিবেচনা কেন করলো? মুখ্যত কারণটা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের শৃঙ্খলা। তার আগে নানান শক্তি সম্বন্ধে তার ভয়ের উদ্ভব হয়েছে। রীতি-নীতি-প্রথা একটু একটু করে তৈরী হয়েছে। এটা অনেকটা আজকের দিনের প্রথার মতন। ধরুন আমি আজকে একটা নীল জামা পরে বেরিয়েছিলাম, কিছু কাজ ছিল। সেগুলো বেশ ভাল হল। এর আগে যদি আমার তেমন ভাল হচ্ছিল না। কাল খয়েরী জামায় হল না। পরণ্ড আবার নীল জামায় হল। তখন মনে হবে যেন নীল জামাইই আসলে একটা বড় ফ্যাশ্টার। ভেতরে একটা বিশ্বাস তৈরী হয় অনেকের। এই করে ঘড়ি পরা থেকে কলম বা মোবাইল নেওয়া, পায়ের জুতো সবেতেই চলে আসে। সে সময়েও তাই হয়েছে। এমন কিছু সমাপতনকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে তৈরী হয়েছে রীতি-নীতি-প্রথা। কিন্তু তাকে ধর্ম বলার মতন সংগঠন অর্জন সে করেনি তখনো। করলো যখন সম্পদের অবস্থান সুনিশ্চিত হল সমাজ জীবনে। ধর্ম তো শুধু ঈশ্বর ভাবনা না, সে আসলে এক ধরণের সমাজ সংগঠন। সে অনেক ক্ষেত্রেই একটা পিরামিডাকার ব্যবস্থা যার শীর্ষে শক্তির উৎস হিসেবে ঈশ্বর আছে। সেই কারণেই ধর্মীয় টেক্সটগুলোতে সমাজবিধির নানা বিধান রয়েছে।

ঋগবেদেও রয়েছে। আমাদের এই উপমহাদেশের গ্রন্থিত নাট্যইতিহাসের আদি কয়েকটি নাট্য, অসম্পূর্ণ হলেও, নাট্য সংগঠনের ভাবনা হিসেবে পরিষ্কার, রয়েছে ঋগবেদের দশম মণ্ডলে। এক একটি প্রোককে বলে ঋক্ বা স্তুতিমন্ত্র। একগুচ্ছ ঋক্ মিলে এক একটি কবিতা বা সূক্ত। এগুলো দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত ঋগবেদে। অধ্যায়গুলোকে বলে মণ্ডল। তার মধ্যে দশম মণ্ডলের পনেরোটি সূক্ত নাট্যগুণসম্পন্ন। প্রাচীনরা একে অনেক সময় কখনো ইতিহাস কখনো আখ্যান বলেছেন। যাক তাঁর নিরুক্তে এবং শৌনক তাঁর সংহিতায় একে বলেছেন সংবাদ-সূক্ত। পণ্ডিতেরা অনেক কথা বলেন। বলেন সোমযজ্ঞের সময় এগুলো গীত হত। প্রাকৃতিক পরিবেশে বৈদিকরা নাচতেন এর সঙ্গে। কেউ কেউ বলেন এর মধ্যেই ছিল গদ্য সংলাপ, যা বেদে গ্রথিত হয়নি। কালের প্রকোপে গিয়েছে হারিয়ে। তা সে যাই হোক, আমরা আমাদের কাজের জন্য বেছে নিয়েছিলাম যম-যমী সংবাদ।

প্রস্তুতির কথা এর আগে অল্প-বিস্তর বলেছি। এবারে বলি কেন বাছলাম তার কথা। যম-যমী সংবাদ ঋগবেদের অনুবাদে বারোবারে অশ্লীলতার জন্য খুব কষ্ট করে প্রকাশিত হয়েছে। নানান রকমের আড়াল-আবডাল রেখে প্রকাশ করা হয়েছে। রমেশচন্দ্র দত্ত অনুবাদ করার সময়ে একে দিবা ও রাত্রির কথা বলে-টলে শাক দিয়ে অনেক মাছ ঢেকেছেন। কিন্তু কেন? কেন না ভাই-বোনের সঙ্গম আজকের সামাজিক চোখে অবৈধ। কেন না এখন আমাদের কাছে বেশ কিছু স্ট্রাডি রিপোর্ট আছে যা বলেছে ইনট্রীডিং ক্ষতিকারক শিশুর পক্ষে। কিন্তু এ যে সময়ের কথা সে সময় তো এই তথ্য ছিল না। সে সময় গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ অত্যন্ত প্রচলিত বিষয় কোথাও কোথাও। নর্স মিথোলজি, ব্যাবিলনিয়ান কাহিনীগুলো এই সম্পর্কের অজস্র প্রমাণ বহন করছে। কিনা ইন্দো-ইরানীয় পুরালোকগাথায় যিম ও যিমেহ যমজ ভাইবোন, যাদের গর্ভে প্রথম মানুষের জন্ম। আদতে যম-যমী সংবাদে যম যদি নতুন সমাজের প্রতীক হয় তাহলে যমী পুরাতন সমাজের প্রতিনিধি। নতুন সমাজ সমস্ত কিছুর মতন যৌনতাকেও এক বিধিতে বাঁধতে চাইছে। পুরাতন চাইছে অবাধ যৌন সম্পর্ক। এমন কনফ্লিক্ট বাকী কোনো নাট্যগুণভূষিত কাহিনীতে ছিল না।

রাত গভীর হল শুশুনিয়াতে। দিনের বেলায় যে কাঠকুটো জড় করা হয়েছে তা কেটেছে তৈরী হল মশাল ও যজ্ঞের কাঠকুটো। অভিনেতাদের কস্টিউম তৈরী হচ্ছিল। সাধারণ এবং হাতের কাছে থাকা জিনিসপত্র দিয়েই সব হচ্ছিল। এক অভিনেত্রীর সন্কেচ ছিল কাঁধ উন্মুক্ত করে গামছাকে কাঁটলির মতন বাঁধতে। সে বাধা পেরোনো গেল। গামছা পরার পরে কিছুক্ষণ চলাফেরার পরে যখন দেখলেন যে এর জন্যে তাঁকে যৌন অবজেষ্ট বলে মনে হচ্ছে না, বা কোনো অশ্লীল ভাবনার উদ্ভেদ হচ্ছে না তখন তিনি বললেন যে এবারে এমন অবস্থায় তিনি যে কোনো কাজ করতে পারেন। ইনি জীবনে কখনো এ ভাবে অভিনয় করেননি। আসলে বাধা পেরোনোটাই থিয়েটারের কাজ। জীবনকে স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ করাটাই একটা বড় কাজ।

আগুণ জ্বলে উঠলো। পাহাড়ের গায়ে ধাপ কাটা সিঁড়িতে সারি দিয়ে দাঁড়ালেন অভিনেতারা। উঁচু থেকে তাঁরা সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসবেন সমতল ক্ষেত্রে। কিছুটা মিছিল করে চলার পরে একটি ঢালু জমিতে হবে নাট্যাভিনয়। মিছিল শুরু হল। বেজে উঠলো মাদল। ঝি ঝি-র আওয়াজ ছাড়া যেখানে আর কোনো প্রাকৃতিক শব্দ ছিল না সেখানে পাহাড় ভরে উঠলো এক রহস্যময় মাদলের দ্রিম দ্রিম শব্দে। প্রকৃতির বুকে, স্বল্প অবলম্বনে অভিনেতারা চললেন, সঙ্গে দর্শকরাও। মাদলের সঙ্গে মিশে গেল বৈদিক ছান্দসের বহুর্কর্মে উচ্চারিত এক গভীর সুর। পাহাড়টা জেগে উঠলো। অজস্র বছর পরে তার নীচে এমন এক



কাণ্ড ঘটছে। এর আগে কয়েক শত বছর বা হাজার বছর আগে কিছু মানুষ হয়তো এমনভাবেই ঘোর রাত্রে নাচতো-গাইতো। আজ আবার হচ্ছে এমন কাণ্ড!

যেখানে গিয়ে পৌঁছলাম সেখানে একটি বিল থেকে জল বেরিয়ে পড়ছে একটি নালাতে। জলের কুলকুলধ্বনি মিশে গেল মাদলের শব্দে। বেজে উঠলো আরেকটি লোক সাঙ্গীতিক যন্ত্র। একতারা। রহস্য গাঢ় হয়ে এল। জুলে উঠলো যজ্ঞের আশুণ। মন্ত্রোচ্চারণে বিরতি নেই। সকল অভিনেতা এখন যাজ্ঞিক। সোমযজ্ঞ হচ্ছে। তার হবন হচ্ছে। সেই যজ্ঞের মধ্যেই একসময় উঠে দাঁড়ালেন দুই অভিনেতা-অভিনেত্রী। তাঁরা প্রকৃত প্রস্তাবে স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু গত দুই রাত্রি তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে এক শয্যাযুগ্মে শুতে যাননি। দিন কাটিয়েছেন নিতান্ত ভাই বোনের মতন। এখন তাঁরা অভিনয় করছেন আদিম দুই ভাই বোনের চরিত্রে। এক বোন যে ভাইকে আকাঙ্ক্ষা করছে, সঙ্গমের অনুরোধ করছে। আরেক ভাই যে সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করছে সমাজনীতি ও দেবতাদের রোষের কথা বলে। নাটক ঘন হতে থাকলো। ঘন হতে থাকলো রাত। আশুণ পলে পলে বেড়ে উঠছে। যাজ্ঞিকরা ক্রটিহীন। মাদল বেজে চলেছে। সঙ্গতে একতারা। বহু বহু দূরের গ্রামের মানুষ পরের দিন ফিরে আসার সময়ে আমাকে বলেছিলেন গভীর রাতেও তাঁরা সেই মাদল আর মন্ত্রোচ্চারণের সুর শনেছেন। ঘোর লেগেছিল তাঁদের। ঘোর লেগেছিল আমাদের অভিনেতাদেরও। ঘোর লেগেছিল আমাদের দর্শকদেরও। পাহাড়, বনভূমি, বিল, মাথার উপরে তারা বলমলে আকাশ অনেকদিন আগের এক স্মৃতি ফিরে পেয়ে কিছুক্ষণ নিশ্চই থম মেরে বসেছিল। আমাদের ক্রটিতে ঠোঁট টিপে হেসেও ছিল হয়তো। ভেবেছিল মানুষের এমন দিনও তো ছিল, তারা যার সব কিছু জানে, মানুষ ভুলে গিয়েছে শুধু। আর তারাও বলবে না। শুশুনিয়া পাহাড়ের উল্টো পিঠে চন্দ্র রাজার পাথর খোদাই ভাবছিলো যে

কেন এখানে এ সব হচ্ছে! তারপরে হেসেছিল। সে তো সেই চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আছে। প্রাকৃত আর সংস্কৃততে খোদাই করা অক্ষর নিয়ে। সে জানে বাগদী, বাউড়ি, জেলে, হাড়ি, ডোম, কুড়ুমালি, মাল পাহাড়ির দেশকে ঐতরেয় উপনিষদ বলেছে অসুরদের দেশ। এখনো কত গ্রামের নাম অসুরদের নামে। সেখানে এক গন্ধর্ব আর অক্ষরার পুত্র-কন্যার কাহিনীই তো হতে পারে। যাদের মধ্যে পুত্রটি পুরাণ মতে পৃথিবীর প্রথম মানব যে মরণশীল ছিল। ফলত সেই প্রথম মৃত পৃথিবীতে। তার সমাজায়ন, আর্ষায়নের কাহিনীই তো আসলে বিবর্তনের এক উপাখ্যান, যা নাচকাঠির দলিত শিল্পীর মাথায় ব্রাহ্মণের পা তুলে দিয়েছে। সেই পাথরে খোদাই হেসেছিল বিষগ্নতায়। এই তো সে দেখে এসেছে এতকাল! মাদল বেজে চলে রাত্রি চিরে...।

শুশুনিয়ার তথ্য



আপাদমস্তক সৃজনশীল মানুষ শুদ্ধসত্ত্ব-র লেখনীর অবাধ বিচরণ গদ্য, কবিতা, নাটক, সঙ্গীত, সাংবাদিকতা - সৃষ্টির নানান অঙিনাতেই। কাগজের পাতায়, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের পর্দায় বা পর্দার আড়ালে, আন্তর্জালের অলিগলিতে সর্বত্রই রেখেছেন তাঁর সৃষ্টিশীলতার সাক্ষর। তাঁর অন্যরকম ভাবনায় উঠে এসেছে মহাভারতের নতুন রূপ। প্রকৃতির বুকে নিয়ে গিয়েছেন মগ্ন এক নাট্য আয়োজনকে, নাট্যশিক্ষা প্রসারের জন্য আয়োজন করেছেন লোকনাট্যশিক্ষার থিয়েটার ট্যুরিজম। ভ্রমণ আর জীবনের রঙ্গমঞ্চকে মিলিয়ে দিয়েছেন এভাবেই। আসলে বেঁচে থাকা আর সৃষ্টিশীলতা তাঁর অভিধানে সম অর্থ বহন করে।



কেমন লাগল :

Like Be the first of your friends to like this.

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00



মাঝে আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল =

সাইকেলে দেশ দেখি

মহম্মদ শরীফুল ইসলাম

~ সাতক্ষীরা থেকে সিলেট সাইকেল ভ্রমণের আরো ছবি ~

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া - এই লাইনকে মিথ্যে করার জন্য প্রায় পাঁচ বছর আগে সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছিলাম তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ দেখার জন্য। সে অভিজ্ঞতার কথাতো আমাদের ছুটির পাঠকেরা জানেনই। সেই থেকেই সাইকেলে চড়ে দেশ দেখা শুরু। রামনাথ বিশ্বাস অথবা বিমল মুখার্জির মতো পৃথিবী ঘুরতে না পারলেও, নিজের দেশটাকে সাইকেলে ঘুরে দেখাটা নেশায় পরিণত হয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় মাথার মধ্যে ঘুরছিল সাতক্ষীরার ভোমরা থেকে সিলেটের তামাবিল বর্ডার পর্যন্ত সাইকেল ভ্রমণের ইচ্ছেটা। সঙ্গী খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম নিয়াজ ভাইকে। শেষ সময়ে বোনাস হিসেবে লিপু ভাইও জুটে গেল আমাদের সঙ্গে। আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতা মিলল ট্রেকার্স বিডি ও আরও কয়েকজনের তরফ থেকে। ঈদের তিন দিন আগে রওনা দেব ঠিক করে টিকিট কেটে ফেললাম। যথাসময়ে আমি আর লিপু ভাই কল্যাণপুর বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে দেখি নিয়াজ ভাই যথারীতি লেট। শেষপর্যন্ত তিনি গাবতলী থেকে বাসে উঠলেন। আমাদের সাইকেল আগেই এসে। এ. পরিবহনের মাধ্যমে সাতক্ষীরা পাঠিয়ে দিয়েছি।

সকালে সাতক্ষীরায় বাস থেকে নেমে দেখি আকাশ বেশ মেঘলা। এসে এ. পরিবহন থেকে সাইকেল ছাড়িয়ে রওনা দিলাম ভোমরা সীমানার দিকে। ভোমরা জিরো পয়েন্ট থেকে ছবি তুলে আমাদের পরবর্তী গন্তব্য খুলনা শহর। পথে লোকজন সাইকেল থামিয়ে জিজ্ঞেস করছে, 'ভাই ঘটনা কি? কই যাবেন?' উত্তর শুনে তো থা! নিয়াজ ভাইয়ের কাছ থেকে একজন বিস্তারিত শুনে সাতক্ষীরার ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারো কি ঈদেও সাইকেল চালাবেন?' নিয়াজ ভাইয়ের উত্তর, 'হুম'; অপরিচিত লোকের উত্তর, 'তা হলি তো পারি আপনারা ঈদি মাটি হই গেল!' এই ধরনের মজার মজার ঘটনার মধ্যেই চুকনগরের বিখ্যাত 'চুইঝাল' খেয়ে খুলনা শহরে যখন পৌঁছলাম ততক্ষণে রাত হয়ে গেছে। সেখানে থাকার ব্যবস্থা হলো নিয়াজ ভাইয়ের বন্ধু সোহেল ভাইয়ের বাসায়। খুলনার জেলখানা ঘাট থেকে নৌকায় করে সোহেল ভাইয়ের বাসায় পৌঁছলাম। বাড়ি দেখতে সর্বাঙ্গিকভাবেই অস্বাভাবিক, বিশাল এক রাজপ্রাসাদ বানিয়ে রেখেছেন।

রাজপ্রাসাদের আরামে সকালে ঘুম থেকে উঠে রওনা দিতে দিতে অনেক বেলা হয়ে গেল। আমাদের আজকের গন্তব্য ভাঙ্গা, দূরত্ব প্রায় ১০০ কিলোমিটার। সোহেল ভাইয়ের কাছ থেকে গোপালগঞ্জ যাওয়ার একটা শর্টকাট রাস্তা জেনে নিলাম - উদ্দেশ্য ছিলো বিধুরোড দিয়ে না গিয়ে গ্রামের ভিতর দিয়ে যাওয়া। সোহেল ভাইয়ের বাসা থেকে বের হতে যাব ঠিক তখনই লিপু ভাইয়ের সাইকেলের পিছনের চাকা বাস্ট করলো, নতুন একটি টিউব লাগিয়ে আমরা রওনা দিলাম। পথে দুবার বৃষ্টির জন্য থামতে হলো, এরপর যে কয়েকবার থামলাম বেশিরভাগই ছবি তোলা আর নামাজের জন্য। গোপালগঞ্জ ঢুকে মনে হল যেন উন্নত কোন এক শহরে এসেছি। গোপালগঞ্জ থেকে টেকের হাটের রাস্তা ধরে চলতে থাকলাম ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে। নদীর পাড় ধরে ভারী সুন্দর রাস্তা। এই পথে গাড়ির সংখ্যা কম, তাই আমাদের চালাতেও সুবিধা হচ্ছিল। ইফতারের ঠিক পরপরই আমরা পৌঁছে গেলাম ভাঙ্গায়। ভাঙ্গায় থাকার ব্যবস্থা হলো লিপু ভাইয়ের খালার বাসায়, লিপু ভাই তাঁর খালার বাসায় এসেছেন বহু বছর পর। তাঁর খালাতো ভাই ভেবেছিলেন আমরা মোটর সাইকেলে আসছি, কিন্তু আমাদের সঙ্গে সাইকেল দেখে তিনি অবাক। বহু বছর পর বেড়াতে আসার সুবাদে আমাদের জোরদার খাওয়া-দাওয়াও হলো।

তৃতীয় দিনে শুরু হলো ঢাকার উদ্দেশ্যে পথ চলা। পথে মাওয়া ফেরি পার হতে হবে। আগামীকাল ঈদ, রাস্তায় তাই অনেক গাড়ি, ঈদে সবাই বাড়ি ফিরছে। পাওয়া পৌঁছানোর আগে রাস্তায় দুটি অ্যান্ড্রিডেন্টের পরের ঘটনা দেখলাম। একটা বাস আর মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ, আরেকটা নসিমন আর বাসের সঙ্গে সংঘর্ষ। মাওয়া পৌঁছাতে যত না সময় লাগলো তার চাইতে বেশি সময় লাগলো ফেরিতে উঠতে। খুব ভিড়। ওপাড়ে নেমে ভিড় ঠেলে রওনা দিলাম ঢাকা শহরের দিকে। সন্ধ্যায় লিপু ভাইয়ের বাসায় ইফতার করে তারপর রওনা দেব শাহবাগের উদ্দেশ্যে। ঈদের দিন সকালেও খাওয়া-দাওয়া করবো লিপু ভাইয়ের বাসায়। ইফতারের ঠিক আগের মুহুর্তে পৌঁছে গেলাম লিপু ভাইয়ের বাসায়। ইফতার শেষ করে শাহবাগ ট্রাভেলার্স অব বাংলাদেশের আড্ডায়। এর মধ্যে নিয়াজ ভাই আন-স্মার্ট থেকে স্মার্ট-এ উপনীত হলেন মানে স্মার্টফোন কিনে ফেললেন। ফলে পরবর্তী কয়েকটা দিন আমাদের খবর সরাসরি ফেসবুকে দিয়ে দেওয়ার একটি মাধ্যমও তৈরি হয়ে গেল। আড্ডা শেষ করে বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত এগারটা বেজে গেল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে ঈদের নামাজ শেষ করে রওনা দিলাম লিপু ভাইয়ের বাসায়। সেখানে ইচ্ছামত পোলাও, মাংস খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম। আজকের গন্তব্য ভৈরব। রাস্তা একদম ফাঁকা, তবে মাথার ওপর প্রচণ্ড রোদ। গত তিনদিন আকাশ মেঘলা ছিল, কিছুটা বৃষ্টিও হয়েছে। একজন আরেকজনের সঙ্গে নানারকম গল্পের মাঝে গুনলাম সদ্য চিন থেকে ফিরে আসা লিপু ভাইয়ের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা। লিপু ভাই চিনে বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী পাভা দেখেছেন। তাঁর কাছ থেকে পাভা সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও জানতে পারলাম। পাভা খাওয়ার মধ্যে খায় কচি বাঁশ। এরা এতই অলস যে পারতপক্ষে একজন আরেকজনের সঙ্গে মিলিত হতেও চায় না। সেইজন্যে এদের বংশ বৃদ্ধিও দিন দিন অনেক কমে যাচ্ছে। এদেরকে টিকিয়ে রাখার জন্য তাই বাধা হয়ে অতিমাত্রার ভায়াগ্রা খাইয়ে বংশ বৃদ্ধির চেষ্টা করছে। এই ধরনের মজার মজার অজানা সব গল্প শুনেতে শুনেতে একসময় পৌঁছে গেলাম ভৈরব শহরে। ভৈরবে উঠলাম একটি হোটেলে। আমাদের জন্য আগে থেকেই সেখানে অপেক্ষা নাদিম ও শরীফ। রাতে ভৈরব ব্রীজের নীচে পাথরের ওপর আর পরে ব্রিজের ওপর বসে বসে স্থানীয় শিল্পীদের গান শুনলাম।

পরদিন ভোর থাকতে থাকতেই রওনা দিলাম। আজকে অনেক দূর যেতে হবে - ১২০ কিলোমিটারেরও বেশি। ভৈরব সেতুর কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে রওনা দিলাম। সেতু পার হয়ে নাস্তা করলাম উজানভাটি রেস্টোরাই। পথে কোন বামেলা ছাড়াই সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে শ্রীমঙ্গল শহরে ঢুকে পড়লাম। আর মাত্র ১৮ কিলোমিটার চালালেই আজকের মতো সাইকেল চালানো শেষ। তবে শ্রীমঙ্গলে বিশাল একটি বিরতি দিলাম, কুটুম বাড়িতে সন্ধ্যায় খেলাম দুপুরের



ভোমরার পথে

© Md. Saifur Islam

খাবার। সেখানে পুশান ভাই আর তার বন্ধুরাও যোগ দিলেন। খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা আবার সাইকেলে উঠে রওনা দিলাম। মৌলভীবাজারে ঢেকার মাত্র ৬/৭ কিলোমিটার আগে শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি। ছোট্ট একটি দোকানে সবাই মিলে আশ্রয় নিলাম। প্রায় দু'ঘণ্টা বসে থাকার পরও বৃষ্টি থামার নাম নেই। সিদ্ধান্ত নিলাম এই বৃষ্টিতেই রওনা দেব, যদি সারা রাত বৃষ্টি হয় তো এখানে বসে থাকার কোন মানেই হয় না। তাছাড়া মৌলভীবাজারে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন পুশান ভাই ও মিশা ভাই। আজকে রাতে মিশা ভাইয়ের বাসায় থাকবো ঠিক করা হয়েছে। মৌলভীবাজারে পৌঁছাতে পৌঁছাতে অনেক রাত হয়ে গেল। একটি হোটলে খাওয়া শেষ করতে করতে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন মৌলভীবাজারের ছেলে রাহী ভাইও। কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে বেশ রাতেই পৌঁছলাম মিশা ভাইয়ের বাসায়।



সাতক্ষীরা

পরদিন একটু বেলা করেই মিশা ভাইয়ের বাসায় খিচুড়ি দিয়ে নাস্তা করে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরোলাম। আকাশের অবস্থা খুব একটা ভাল না, কালকে সারারাত বৃষ্টি হয়েছে। বের হওয়ার সময় ঠিক করে নিয়েছি যত বৃষ্টিই হোক আজকে তার মধ্যেই চালাবো। আমরা মৌলভীবাজার-সিলেটের মূল রাস্তা বাদ দিয়ে ফেঞ্চগঞ্জের রাস্তা দিয়ে রওনা দিলাম। পথে ভৈরবের নাঙ্গিমের ফোন পেলাম, তিনি কাঁধে ব্যাগ নিয়ে হেঁটে হেঁটে সিলেটের পথে রওনা হয়েছেন। ভৈরবে আমাদের দেখেই তার মাথার মধ্যে এসেছে তারও একটা কিছু করতে হবে! শাহপরানের মাঝারের কাছ যেতে যেতে বৃষ্টির পাল্লায় পরলাম। ভিজতে ভিজতেই আমরা সামনে এগিয়ে যেতে থাকলাম। জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্কুল ও কলেজের কাছে এক বাজারে ডিম আর পরোটা দিয়ে দুপুরের খাবার খেলাম। পথে সিলেটের দুই সাইক্লিস্টের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ গল্প করলাম আমি আর লিপু ভাই। নিয়াজ ভাই অবশ্য সবসময় ঘণ্টায় ২০/২৫ কিলোমিটার বেগে সামনে এগিয়ে থাকেন ধরা ছোঁয়ার বাইরে। সন্ধ্যার দিকে লিপু ভাইয়ের পেছনের চাকা দ্বিতীয়বারের জন্য পাংচার হলো। টিউব পাল্টে ফেলা হলো। মোহাম্মদ ভাইয়ের অফিসের ফ্যান্ডি টি এস সি ও পাওয়ার লিঃ-এ থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছেন মোহাম্মদ ভাই।

ফ্যান্ডিটি তামাবিল বর্ডারের ঠিক ৩ কিলোমিটার আগে। কিন্তু স্থানীয় লোকজন এই নামে ফ্যান্ডিটি চেনে না, চেনে খাম্বা ফ্যান্ডি নামে। এই ফ্যান্ডিতে বিদ্যুতের খাম্বা তৈরি করা হয়। আমরা খাম্বা ফ্যান্ডিতে পৌঁছলাম রাত ৮ টার পরে। রাতে খাওয়াদাওয়া তারপর পুকুরের গোসল করা, ১২ টার পরে বারবিকিউ পাটি - সব মিলিয়ে অসাধারণ।

ইচ্ছা ছিল খুব ভোরে রওনা দেব, কিন্তু বৃষ্টির জন্যে তাড়াতাড়ি বেরোনো গেল না। সকালে নাস্তা হিসেবে খিচুড়ি খেয়ে রওনা দিলাম আমাদের শেষ গন্তব্য তামাবিল। তামাবিল শেষ গন্তব্য হলেও আমরা এরপরে জাফলংয়েও যাব। এত কাছে এসে জাফলং না গেলে ভ্রমণটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তামাবিল পৌঁছে কিছু ছবি তুললাম, তারপর জাফলং। জাফলংয়ে খুব ভালো কিছু সময় কাটিয়ে, সিলেটের পথ ধরলাম, তবে সাইকেলে না একটি পাথরবোঝাই ট্রাকে।



~ সাতক্ষীরা থেকে সিলেট সাইকেল ভ্রমণের আরো ছবি ~

বিপদেআপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই 'সেইফ' (Safety Assistance For Emergencies) -এর প্রধান কাজ। এর বাইরেও সেইফের নিয়মিত কর্মী শরিফুলের জীবনের আরেক নাম ভ্রমণ। পায়ে হেঁটে, সাইকেলে, নৌকায় এখাবত নানান অভিযানে অংশ নিয়েছেন তিনি। এরমধ্যে সাইকেলে বাংলাদেশের চৌষটি জেলা ভ্রমণ, পায়ে হেঁটে তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ, সাইকেলে শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সময় পেলেই বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকার ভ্রমণের পাতায় লেখেন সেইসব অভিজ্ঞতার কথা।



কেমন লাগল :

Like Be the first of your friends to like this.

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

স্থিতিধরের শিখর ছুঁয়ে

দেবজিৎ ভৌমিক

~ স্থিতিধর ট্রেক রুটম্যাপ ~ স্থিতিধর ট্রেকের আরো ছবি ~

আওয়াজ হল ঝুপ!

অভিজিৎদা তাড়াতাড়ি স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এসে টটটা জ্বালাল। তাঁরুর ছাদের দিকে তাকিয়ে বলল, বরফ পড়ছে, আজকে আর ঘুমানো যাবে না! খানিক পরে পরেই হাত দিয়ে খুঁচিয়ে বরফ ফেলা চলতে থাকল। প্রথমে একটু ভয় পেলেও, পরে নিশ্চিত হলাম এই ভেবে যে অভিজিৎদা আছে। শেষের দিকে খানিকটা ঘুমিয়েও পড়েছিলাম। পরের দিন শেষপর্যন্ত প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। এইভাবে তাঁরুর ওপর বরফ পড়ার জন্য চাপা পড়ে ট্রেকারদের মারা যাওয়ার ঘটনা এতদিন শুধু শুনেইছিলাম, নিজেদের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারলাম সত্যিকারের ব্যাপারটা কতটা ভয়াবহ। ভাগ্যিস আমরা ঠিক সময়ে টের পেয়েছিলাম!

এইসব শুরু হয়েছিল প্রায় তিন মাস আগে, যখন আমাদের ক্লাব 'অ্যাডভেঞ্চার'-এর পক্ষ থেকে এই হাই অল্টিচুড ট্রেকে যাওয়ার কথা ঠিক হয়। মানালির কাছে ১৭,০০০ ফুট ওপরে স্থিতিধর এবং ফ্রেডশিপ এই দুই পাহাড় চূড়ায় ওঠার লক্ষ্যে। পাঁচজনের দলে বাকী চারজনেরই রক ক্লাইমিং-এ ভালো প্রশিক্ষণ ছিল। তাই ঠিক হল আমি বেস ক্যাম্পেই থেকে যাব আর বাকীরা পাহাড় চূড়ায় উঠবে।

কাহিনি শুরুর আগে পাত্রপাত্রীদের অর্থাৎ নিজেদের একটু পরিচয় দিয়ে রাখি - আমি আর দলনেতা অভিজিৎদা দুজনেই বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ থেকে ডক্টরেট শেষ করে ওখানেই কর্মরত। আমাদের দলের সবচেয়ে দায়িত্ববান অভিজিৎদার ভাই সন্ত কগনিজেন্টে আছে। ট্রেকের এই ব্যাপারটার ব্যবস্থাপনার সব দায়িত্বই প্রথম থেকেই নিজের কাঁধে নিয়ে নিয়েছে। তাপস বনগাঁর একটা স্কুলের পার্শ্ব শিক্ষক। সুজয় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করে পাটনায়। শেষের তিনজন একসঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছে শিলিগুড়ি থেকে। সুজয় আমার দেখা প্রথম এবং সন্তবত শেষ মানুষ যার ইনার পায়জামার মত ঢিলে হয়ে পতপত করে উড়তে পারে। তাপস আর সুজয় খুব ভালো বন্ধু। কিন্তু ওরা নিজেদের মধ্যে সবসময় চূড়ান্ত পর্যায়ের ঝগড়া চালিয়ে যায়, দেখে মনে হয় এবার মারপিট হবে। একটা মজার গল্প শুনেছিলাম - গত বছর ওরা দুজনে মিলে রক ক্লাইমিং-এর প্রশিক্ষণ নিতে গিয়েছিল। প্রথম দিন সকাল থেকেই সাংঘাতিক ঝগড়া শুরু করে, এমনকী দড়ি ধরে উঠতে উঠতেও ঝগড়া করছিল। বাকীরা কেউ ওদের চিনত না তাই সবাই সারাক্ষণ তটস্থ হয়ে ছিল। দুপুরে দেখা গেল তাপস পাগলের মত সুজয়কে খুঁজছে সিগারেট খাবে বলে, একা তো খেতে পারে না! এদিকে লোকজনেরা সবাই ভ্যাচাচাকা খেয়ে গেল কিছু বুঝতে না পারে। তখন সন্ত তাদের বলে যে এরা নিজেদের এগারো বছর ধরে চেনে আর এটাই ওদের প্রতিদিনের রুটিন।

৪ অক্টোবর হাওড়া থেকে রাজধানী এক্সপ্রেসে রওনা দিয়ে ৫ তারিখ বিকেলে দিল্লি পৌঁছালাম। সেখান থেকে বিকেলের বাস ধরে মানালি। যাবার পথেই খবর পেলাম আমাদের গাইড বলবাহাদুর আর দুজন পোর্টার উত্তর কাশী থেকে ৬ তারিখে মানালি এসে পৌঁছাতে পারবেনা কারণ সেখানে তখন চাক্ষা বনধ চলছে। শুরুতেই একদিন নষ্ট। যাইহোক আমরা মানালিতে নেমেই কাঁচা বাজার আর মুদির দোকান থেকে কেনাকাটা সেরে রাখলাম। এখান থেকে আরও দুজন পোর্টারও নিয়ে নিলাম।

৭ তারিখ সকালে তাড়াতাড়ি উঠে মালপত্র, স্যাক সব নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লাম। আমাদের লক্ষ্য ডুণ্ডি। ওখানে পৌঁছে জলখাবার খেয়ে হাঁটা শুরু হবে। পথে জানা গেল এই ট্রেকটা করতে গেলে হিমাচল প্রদেশ ট্যুরিজম থেকে একটা অনুমতি পত্র করাতে হয়। আর তা আমাদের কাছে নেই। আমাদের আগে ঠিক করাই ছিল যে মানালি পৌঁছে ট্যুরিজমের অফিস থেকে ট্রেকরুট ও অন্যান্য খোঁজখবর নেওয়া হবে। কিন্তু গতকাল রবিবার থাকায় সরকারি দপ্তর সব বন্ধ ছিল। তাই স্রেফ গাইডের আশ্বাসের ভরসাতেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। এবারে আশ্বাস এল ড্রাইভারের কাছ থেকে। অতএব এগিয়ে চললাম।



ডুণ্ডি ছাড়িয়ে

সোলাং ভ্যালির পর চেক পোস্টে পথ আটকালো - পারমিট কাঁহা?

ড্রাইভার জবাব দিল - ইয়ে ইন্সটিটিউট ওয়ালে হায়।

চেক পোস্ট ওয়ালে এবারে জানতে চায় - তো ইউনিফর্ম কাঁহা হ্যায়?

ড্রাইভারের আত্মবিশ্বাসী উত্তর - হ্যায় না, ব্যাগ মে।
চেকপোস্ট পেরোনোর পর ড্রাইভার গর্বের সঙ্গে জানায়, তার গাড়িতে ইন্সটিটিউট ওয়ালারা খুব যাতায়াত করে, না হলে আমাদের এত সহজে ছেড়ে দিত না।

খরস্রোতা বিপাশার পাশ ধরে ধরে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলল। খানিক পরে ডুণ্ডি ঢুকলাম। দুটো সরকারি বাড়ি ছাড়া জায়গাটায় আর কিছুই নেই। বিপাশার বন্যায় আগের ব্রিজ ভেঙ্গে যাওয়ায় নতুন ব্রিজ তৈরির কাজ চলছে। বুঝলাম যে এখানে কোনমতেই খাবার পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এখনপর্যন্ত কলকাতায় বসে পাওয়া আমাদের কোন খবরের সঙ্গেই বাস্তব কিছু মিলছে না।

এযাবত আমার স্যাকটা অনেকটাই খালি ছিল, বাকীরা সেই সুখবরটা জানা মাত্র নিজের নিজের কিছু কিছু মালপত্র আমার স্যাকে চালান করল (এর মধ্যে ৭৫০ মি. লি.-এর একটা ওল্ড মস্কও ছিল, কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম ফেরার পথে 'বড়াখানা' হবে তখন কাজে লাগবে) - ওদের সবার স্যাকই ইতিমধ্যে প্রায় ফেটে যাওয়ার সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছিল। শুনে একটু আশ্বস্ত হয়েছিলাম যে ওই জগদন্দলটা পোর্টারদের কাঁধে যাবে আর আমি ফাঁকা যাব। কিন্তু সে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী - পোর্টাররা জানালো মাল বেশী আছে, ওই স্যাক আমাদেরই নিতে হবে। তবে বাকীরা আমাদের সবথেকে হাল্কা স্যাকটাই দিয়েছিল। আর অসীম সাহসে সন্ত ওটাকে কাঁধে তুলে নিয়েছিল। পরে স্যাকটা নিয়ে বুঝেছিলাম ওটা কাঁধে নিলে আমাকে আর হাঁটতে হতো না। অনেকটা যাওয়ার পর সন্তর প্রতিদিনের জিম করা শরীরও জবাব দিতে শুরু করেছিল।

প্রায় এগারোটা বাজে। আমাদের প্রথম দিনের লক্ষ্য 'বিয়াস কুণ্ড'। খালিপেটে অতটা যাওয়া যাবে কীনাও তাও বুঝিছিল। তাও অভিজিৎদা বলবাহাদুরকে বলল, 'চলিয়ে'।

জানতামনা এবারেই আমাদের জন্যে সবচেয়ে বড় চমকটা অপেক্ষা করছে। বলবাহাদুর নির্লিপ্ত গলায় জানালো, 'রুকিয়ে পুছতে হায়, কাঁহাসে যানা হায়?'

আমরাতো কেউ রাস্তা জানিহিনা, এবারে টের পেলাম স্বয়ং গাইডও রাস্তা জানে না, কারণ মানালিতেই সে এই প্রথম এসেছে। পোর্টাররা এবার হাসতে শুরু করল, 'ক্যাসে যাওগে খুদকো রাস্তা মালুম নেহি, গাইডকোভি মালুম নেহি?' অগত্যা রাস্তা জানা পোর্টার বাবাজিই এই যাত্রায় আমাদের গাইড হল।

বিপাশার পাশ দিয়ে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। প্রথমদিকে হাঁটা বলতে শ্রেফ বোস্তার ডিঙানো। এরপর খালি ওপরে ওঠা। আস্তে আস্তে মানুষের কোলাহল, যন্ত্রের আওয়াজ, আমাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পেরে পিছিয়ে পড়ে শেষে চূপ করে গেল। বিপাশার কঙ্কোলে ভরপুর প্রকৃতির সৌন্দর্য তখন আমাদের ঘিরে রেখেছে। বেশ খানিকক্ষণ হাঁটার পর খালিপেটে থাকার কষ্ট আর ক্লান্তি শুরু হল। সঙ্গে থাকা গ্লুকোজ জল আর ভেজানো ছোলা-বাদাম বেশ কাজে লাগলো। মাঝে মাঝে খানিক জিরিয়ে নিয়ে এগোতে লাগলাম।

ওপরে ওঠার পথে আরেকটা বড় দলের সঙ্গে দেখা হল, এরা আরেকটি শৃঙ্গ হনুমান টিকা জয় করে ফিরছে। একদল বিদেশিও দেখা মিলল, এরা

বিভিন্ন দেশ থেকে এজেপির মাধ্যমে এসেছে। প্রায় ঘন্টা দুই হাঁটার মধ্যে বেশ কয়েকবার ভেড়ার পাল চোখে পড়ল। তবে যেটা দেখার মতো তা হল ভেড়া পাহারা দেবার কুকুর। কল্পনাশক্তিকে একটু উদ্দীপিত করলে ওগুলোকে অনায়াসে কেঁদো রয়াল বেঙ্গল টাইগার আর টিবেটিয়ান ম্যান্ড্রিলের ফ্রস ব্রিড বলে চলিয়ে দেওয়া যায়। তিনঘন্টার রাস্তা শেষে আমরা বারকাখাচ (১১০০০ ফুট) এসে পৌঁছলাম, ঠিক হল এখানেই আমাদের তাঁরু পড়বে।

বিকেলের দিকে ঠিক হল কাছের ক্যাম্পটায় যাওয়া হবে। এটা 'অটল বিহারী বাজপেয়ী মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যালায়েড স্পোর্টস'-এর স্থায়ী বেস ক্যাম্প। যাবার কারণটা অবশ্য গুরুতর। এতকিছু আনা হলেও দেশলাই আনা হয়নি, ফলে রাতের রান্না বসানো যাচ্ছে না। পথের হৃদিশ জেনে নেওয়াটাও জরুরি। কিন্তু দেশলাই পাওয়া গেলেও রাস্তার নির্দেশ ঠিক পাওয়া গেল না, কারণ যে গাইডরা জানে তারা দল নিয়ে এগিয়ে গেছে। তবে আশা এটাই যে পথে ওদের দেখা মিলবে।



বিয়াস ক্যাম্পে ভোর

একটা কথা মাথার মধ্যে কয়েকদিন ধরেই ঘুরছিল যে 'বড়াখানা' ব্যাপারটা কী? জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম ফেরার দিন এখানে রাতে ক্যাম্প করা হবে। আর একটা ভেড়া কিনে হবে জমিয়ে ভোজ। ভেড়ার শিককাবাব খাওয়ার সম্ভাবনায় বেজায় আনন্দ হল। যদিও অসহায় ভেড়াটার কথা ভেবে খারাপও লাগছিল। তবে সেই ভেড়ার এই জন্মের বা আগের জন্মের অশেষ পুণ্য তাকে শেষপর্যন্ত বাঁচিয়ে দেয় - যথাসময়ে সে প্রসঙ্গে আসছি।

৮ তারিখ সকালে উঠে আবার রওনা। নদী পেরিয়ে ফের গাদা বোস্তার। তারপর খাড়া পাহাড়, দেখে মনটা দমে গেল কিন্তু সামনে নতুন কিছু দেখতে পাবার আশায় লড়ে গেলাম। বারবার দম নিয়ে এগোতে লাগলাম। সুজয়তো একেবারে নিশ্চিত যে এরপরেই উপত্যকা পাওয়া যাবে আর স্থিতিধরের দেখা মিলবে। কোনোমতে পাহাড়টার মাথায়তো উঠলাম। উঠে দেখি যতদূরে চোখ যায় নানা আকার আর আয়তনের সাদা বোস্তার সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে। খাড়া পাহাড়ে ওঠা তাও ভালো কিন্তু

বোস্তার আরও বিপজ্জনক। পা দিলেই দেখা যায় বোস্তারগুলো হয় কাঁপছে, নয় গড়িয়ে পড়ছে। আর পা আটকে গেলেতো ভাঙ্গা অনিবার্য। একপ্রহ্ন দম নিয়ে একটু ভয়ে ভয়েই এগোলাম। খানিক চলার পর আবার পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেলাম, যাক শান্তি।

একটু এগিয়ে এবার খাড়া নামা। বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে কতগুলো রঙিন তাঁরু চোখে পড়ছে। কিন্তু টেলিফটোলেস লাগিয়েও 'বিয়াস কুণ্ড' খুঁজে পাচ্ছি না। তবে তাঁরুগুলোর পাশে একটা বড় ঝরনা দেখে আন্দাজ করতে পারছি ওর নীচেই থাকবে। অনেকটা নীচে নেমে তারপর হঠাৎ করে পাওয়া একদম সমতল মাটিতে হেঁটে খরস্রোতা বিপাসার মুখোমুখি হলাম। কয়েক কর্ণ কিলোমিটার উপত্যকা জুড়ে বিপাশা তার অগুপ্তি শাখা-প্রশাখা নিয়ে বয়ে এসে আমাদের সামনে মিশে চওড়া হয়ে সশব্দে পাহাড় ফাটিয়ে মহা কোলাহলে এগিয়ে চলেছে। এখানে দাঁড়িয়ে মনে হয় সত্যিই মানুষের থাকার কোন দরকার আছে কি? আমাদের ছাড়া দিব্যিইতো দিন কাটছে বিপাশার, বরং আমরাই প্লাস্টিক ছড়িয়ে বাঁধ বানিয়ে সর্বনাশ করছি।

বিপাশার পাশ দিয়ে আমরা ঝরনার দিকে এগোলাম। কাছাকাছি আসতে বুঝলাম ঝরনাটা বেশ ভালোই উঁচু, বহু উপর থেকে সাদা জল বিপুল বেগে নীচে এসে পড়ছে। কলকাতায় অনেকে বেশ অর্ধেক হন এই ভেবে যে পূজোর আনন্দ ফেলে এত টাকা খরচ করে, এত কষ্ট করে এসব করা কেন? ঝরনার সেই অপূর্ণ সৌন্দর্যের সামনে এসে মনে হল তাঁরা যদি কোনদিন এখানে এসে দাঁড়াতে পারেন তাহলে নিজেরাই সেই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।

এবারে বিপাশার প্রধান শাখাটা পেরোতে হবে। সহজ অংশটা অনেক নীচে ফেলে এসেছি। এখানে নদীটা তুলনায় সরু হলেও অস্তুত দশ ফুট চওড়া। আমরা পাঁচজনে হিউম্যান চেন বানিয়ে কোনক্রমে নদী পার করলাম, ভেসে গেলে আর খুঁজে পাওয়া যেত না। আরও কিছুটা এগিয়ে আমাদের বেস ক্যাম্পটা (১১,৫০০ ফুট) চোখে পড়ায় নিশ্চিত হলাম। কিন্তু তাও বিয়াস কুণ্ড নজরে এল না। পোর্টার আঙুল তুলে সরু একটা ঝরনা দেখিয়ে বলল ওর নীচে। আমরাও ক্যাম্পে স্যাক নামিয়ে সেদিকে এগোলাম।

আমি নিজের চোখে এত পরিষ্কার জল নীল জল আগে কখনও দেখিনি। এতটাই স্বচ্ছ যে অনায়াসে কুণ্ডের প্রায় ত্রিশ ফুট গভীর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। সারাটা দিন কাটলো বিপাশার সঙ্গেই। রাতে তাঁরুর বাইরে বেরিয়ে অর্ধেক হয়ে গেলাম - আজি যত তারা ভব আকাশে, সত্যিই যেন মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে...। আকাশে একসঙ্গে এত তারা থাকতে পারে - আমার ত্রিশ বছরের ক্ষুদ্র জীবনে আগে কখনও দেখেছি বলেতো মনে পড়ে না!!

৯ তারিখ সকাল থেকেই সাজো সাজো রব। বেশিরভাগ মালপত্র বেসক্যাম্পেই থাকবে। সেসব পাহারা দিতে রয়ে যাবে আমাদের এক পোর্টার লাকি। তাঁরু ও জরুরি কিছু জিনিস নিয়ে আমরা উঠব। অ্যাডভান্সড বেসক্যাম্পে পৌঁছানোর আগে পর্যন্তও আমরা নিশ্চিত নই যে ঠিক কোন পাহাড়টায় চড়বে। একটাই আশা যে আমাদের সঙ্গে যে বিদেশিরা উঠেছে ওদেরও লক্ষ্য স্থিতিধর। ফলে ওদের গাইডের কাছ থেকেই অ্যাডভান্সড বেস ক্যাম্পের পথ জানা যাবে। সোজা ভাষায় বললে ওদের পিছু পিছু গেলেই ঠিক পৌঁছে যাব এই আশাই করে আছি।

সকাল দশটা নাগাদ বিদেশিদের অনুসরণ করে আমাদের চলা শুরু হল। প্রথম চড়াইটায় উঠেই আমি বুঝতে পারলাম আর ওপরে গেলে আমার অসুবিধা হতে পারে, সেক্ষেত্রে সবাইকে নেমে আসতে হলে ব্যাপারটা ভালো হবে না। ঠিক করলাম বেসক্যাম্পে ফিরে যাব। ফিরে এলাম। গোটা চতুরে শুধু আমি আর লাকি ছাড়া অন্য কোনো মানুষ নেই। সকালে বেশ ঝকঝক আকাশ ছিল, দুপুর দুটোর পর থেকে আকাশের মুখ ভার হতে শুরু করল। আমাদের দলটাকে যতক্ষণ

পারলাম ক্যামেরা দিয়ে অনুসরণ করলাম। একসময় ওরা মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেল।

এর পরের ২৬-২৮ ঘন্টার কথা বাকীদের বর্ণনা শুনে এক জায়গায় করেছি। একটা কথা সবাই ফিরে এসে একমত হয়েছিল যে আমার ফিরে আসার সিদ্ধান্তটা একদম সময়েপযোগী হয়েছিল। বাকী রাস্তাটা শ্রেফ খাড়া ওঠা ছাড়া কিছু নয়। জায়গায় জায়গায় রাস্তা বলতে প্রায় ৮০ ডিগ্রি খাড়া পাঁচিল হাতড়ে হাতড়ে ওঠা। সুজয়ের বর্ণনায়, 'যমের বাড়ির দক্ষিণ দূয়ারের রাস্তা'। সবার শরীরের অবস্থাই শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। মাঝরাস্তায় অভিজিৎদা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে। সন্ত একটা ক্যাডবেরি আর জল খাওয়ায়। এরপর সুজয়ের কথা অনুযায়ী, 'দাদা যে সেই দৌড় লাগালো, আর দেখা গেল না। একটা ছোটো ক্যাডবেরির এত শক্তি তা জানতাম না।' পুরোটা প্রায় চার ঘন্টার টানা চড়াই ছিল।

আমাদের টিম অ্যাডভান্সড বেসক্যাম্প বেস ক্যাম্প (১৪,৭০০ ফুট) পৌঁছে দেখল ইতিমধ্যে বিদেশীদের ন'টা তাঁরু লাগানো হয়ে গেছে। আর মাত্র



অ্যাডভান্সড বেস ক্যাম্পের পথে



অ্যাডভান্সড বেসক্যাম্পে

একটা তাঁরু লাগানোরই জায়গা রয়েছে, অথচ লাগাতে হবে মোট তিনটে তাঁরু। শেষে বলবাহাদুর আর তার ভাই তেজবাহাদুর মিলে খাদের ধার থেকে পাথর সরিয়ে কোনমতে সামান্য একফালি সমান জায়গা বের করে পাশাপাশি দুটো তাঁরু লাগায়। খাদের ধারের তাঁরুতে সারারাত অ্যাডভান্সডের শব্দ শুনতে শুনতে আর ঘুমাতে পারেনি সন্ত।

১০ তারিখ সকালে হালকা জলখাবার খেয়ে ওরা রওনা দেয়। আগেরদিন যে ছোট হিমবাহটার সামনে আমাদের তাঁরু পড়েছিল, আজ তাকে পেরিয়েই উঠতে হবে। পথের সফল অল্প কিছুটা দড়ি আর খানকয়েক আইস অ্যান্স। এইটুকু দড়িতে ওঠা সম্ভব নয় রাতেই অন্য দলের লোকজন বলেছিল। বিদেশীদের সরঞ্জামের বহর দেখে সন্ত আর সুজয় কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঠিক এই জায়গাতে এসেই আমাদের রাস্তা না জানা দুই বাহাদুরের ওস্তাদি বোঝা গেল। ওরা আগে এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ের দেওয়ালে দড়ি বাঁধতে লাগলো আর দলের বাকীরা বরফ এড়িয়ে খালি পাথরের দেওয়াল ধরে

এগোতে থাকল। এরমধ্যে একটা ছোট অ্যাডভান্সড পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। যেটা সবচেয়ে বড় অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল তা হল ছোট ছোট আলগা ঝুরো পাথর। গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফলে হিমবাহ গলে গিয়ে তলার পাথর বেরিয়ে এসেছে।

সবচেয়ে সামনে দুই বাহাদুর তারপর অভিজিৎদা উঠেছিল। সবশেষে তাপস, মাঝে সন্ত আর সুজয়। এরমধ্যে হঠাৎ করে ওপর থেকে একটা বড় পাথর গোলার মতো ছুটে আসে। আসার পথে তেজ বাহাদুরের সঙ্গে থাকা বিস্কুটের ব্যাগ উড়িয়ে নিয়ে যায়। অভিজিৎদা পরে বলছিল, 'ওপর থেকে দেখছি পাথরটা ভাইটার দিকে যাচ্ছে, ওকে আর ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারব কীনা এই কথাটা মনে হচ্ছিল'। বরফ ছড়িয়ে পাথরটা চলে যাবার পর প্রথমে সন্তকে ওখানে দেখা যাচ্ছিল না। কয়েক মুহূর্ত পরে বোঝা যায় ও আর উপায় না দেখে বরফের ওপরে সটান শুয়ে পড়ে। পাথরের গোলা সামান্যর জন্য ওকে ছুঁতে পারে নি। মুহূর্তের একটা সিদ্ধান্ত কত কিছু বদলে দিতে পারে ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। তবে টানটান এই পুরো ঘটনাটায় কমিক রিলিফের মন্তব্যটা এল তাপসের কাছ থেকে। বেশ খানিকটা পরে ও নীচ থেকে ওপরে এসে দেখে বরফের ওপর বিস্কুট ছড়িয়ে আছে। একটা পাথর ভেঙ্গে কীকরে বিস্কুট ছড়াতে পারে সেটা কিছুতেই ওর মাথায় ঢুকছিল না। নিঃসন্দেহে খুব ভয়াবহ চিন্তা!

আরও কিছুটা এগিয়ে দেখা গেল রাস্তা 'Y'-এর মতন দু'ভাগ হয়ে গেছে। সুজয় অনেক আগে থেকেই আপনমনে নিশ্চিত ছিল যে বাঁদিকেই যেতে হবে। এখানে আবার দ্বিতীয় বাহাদুরি গুড়ি গোয়েন্দাগিরি দেখালো বলবাহাদুর - ডানদিকের রাস্তায় খানিক দূরে একটা সানগ্লাস আর গ্লুকোজের কৌটো পড়ে আছে। এই অসামান্য এবং অভ্রান্ত পথনির্দেশ দেখে আমাদের দল ডান দিকে এগিয়ে গেল। কেবল সুজয় শেষপর্যন্তই কিন্তু কিন্তু করে যাচ্ছিল। এমনকী পাহাড় চূড়ায় পৌঁছেও সে অভিজিৎদার কাছে সন্দেহ প্রকাশ করে যে ঠিক চূড়ায় পৌঁছেছিতো? ভাবখানা এই যে ডাইনে বাঁইয়ে আর যে কটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে সেগুলো একবার ঘুরে নিলে বেশ নিশ্চিত হওয়া যায়। একেতো নিশ্চিত হতে পারছে না, তার ওপর এত কষ্ট করেও বেচারার অনেকদিনের একটা স্বপ্নপূরণ হল না। ওর দীর্ঘদিনের ইচ্ছে ছিল কোন একটা পাহাড়চূড়ায় উঠে সেখানে বসে গোটা একটা বিড়ি একাই খাবে। কিন্তু বিড়ি জ্বালিয়ে সবে দুটো সুখটান দিয়েছে অমনি অভিজিৎদার শ্বাসকষ্ট শুরু হল। বেচারাকে স্বার্থত্যাগ আর বিড়িত্যাগ দুটোই করতে হল।

অ্যাডভান্সড বেসক্যাম্প বেস ক্যাম্প থেকে বিপাশার বেস ক্যাম্প পর্যন্ত নেমে আসার সময় আর গোটা দুয়েকই উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। আকাশজোড়া বিশাল একটা রামধনু দেখে ওরা মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু ছবি তোলা হয়নি। দ্বিতীয় ঘটনাটা বেশ সাংঘাতিক - বেশ খানিকটা নেমে আসার পর সুজয় হঠাৎ খেয়াল করে ওর পিঠে ব্যাগ নেই যাতে ওর মোবাইল ফোন, সানগ্লাস আর আমাদের যাবতীয় ওষুধ ছিল। অতএব ওকে আরও একবার যমের দক্ষিণ দূয়ারের পথে হাঁটা লাগতে হয়।

১১ তারিখ সকাল থেকেই শুরু হল বৃষ্টি। একেবারে শিলাবৃষ্টি - নারকেল নাড়ুর আকারের বরফের টুকরোয় খানিকক্ষণের জন্য চারদিক সাদা হয়ে গেল। পরে অবশ্য রোদও উঠেছিল। দুপুরে বলবাহাদুর একাই বেরিয়ে গেল ফ্রেণ্ডশিপ শৃঙ্গের রাস্তা ঝুঁজতে। বিকেলের দিকে আবহাওয়া আরও খারাপ হয়ে এল। তাও আমরা ঠিক করলাম পরেরদিন সকালেই ফ্রেণ্ডশিপের অ্যাডভান্সড বেসক্যাম্প বেস ক্যাম্পের জন্য বেরিয়ে পড়া যাবে। ১৩ তারিখ শৃঙ্গ বিজয় সেরে



হুইতিধর ও ফ্রেণ্ডশিপ পীক ট্রেক রুট

বারকাথাচে গিয়ে তাঁরু ফেলব (আমার মনে শিককাবাবের স্বপ্ন ভিড় করে এল)। রাতে বৃষ্টির সঙ্গে তুষারপাতও শুরু হল। খানিক পরেই টের পেলাম তাঁরু ভিতরে জল পড়ছে মানে তাঁরু ওপরের প্রাস্টিকের চাদর সরে গেছে। আমি বাইরে বেরিয়ে চাদরটার পেরেকগুলো ঠিক করে ফাটা চাদর প্রাস্টিক দিয়ে ঢেকে দিলাম। উফফ কী কনকনে ঠাণ্ডা – এত ঠাণ্ডায় আগে কখনও বাইরে বেরিয়েছি বলে মনে পড়ে না, আসলে প্রাণের দায় বড় দায়। যদিও নিজেকে বেশ সুপারম্যানের মতোও মনে হচ্ছিল।

সুজয়ও বাইরে এসেছিল। নীচু হয়ে তাঁরু একটা পেরেক ঠিক করার পর মাথা তুলে দেখে ওর সামনে টর্চ নিয়ে আট-দশজনের একটা বড় দল। ওরা এই অন্ধকারের মধ্যেই অ্যাডভাঞ্চার বেসক্যাম্পে ক্যাম্পের দিকে যাচ্ছে। সম্ভবতঃ বিদেশিদের দলটা কোনো বড় দুর্ঘটনায় পড়েছে এরা উদ্ধারকারী দল।



শিখর ছুঁয়ে

১২ তারিখ সকালে তাঁরু বাইরে বেরিয়ে দেখি চারদিক সাদা, আকাশের মুখ প্রবল গোমড়া। এখানেই অভিযান মূলতুবি করে নেমে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ইতিমধ্যে আরও একটা উদ্ধারকারী দল নীচ থেকে উঠে এসেছে। জানতে পারলাম গতকাল বিকেল থেকে একজন বিদেশি সহ মোট তিনজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওরা পাহাড় চূড়া থেকে নেমে আসার পর যে বড় পাথরে দড়ি বেঁধে নামছিল সেটাই হঠাৎ গড়িয়ে চলে আসে। ভাগ্য ভালো যে বাকী দলটা তখন রাত্তা থেকে সরে গিয়েছিল। কেবল শেষজন পোর্টারকে নিয়ে দাঁড়িয়ে গাইডের ছবি তুলছিল। নেমে আসার সময় শেষ যে খবর পাই পোর্টার আর সাহেবের দেহ পাওয়া গেলেও গাইডকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। উদ্ধারকারী একের পর এক দল আর সরকারি অফিসারদের হাঁটাচলায় বিয়াস কুণ্ড ক্রমশঃ সরগরম হয়ে উঠছিল। বারকাথাচে আর না থেমে আমরা সরাসরি মানালিতে নেমে আসি। এযাত্রায় ভেড়ার শিক কাবাবের দুগ্ধ তাওয়া চিকেন দিয়েই ভুলতে

হল। সত্যি বলতে কী অক্ষত অবস্থায় সশরীরে নেমে আসতে পেরেছি এতেই যথেষ্ট আনন্দ হচ্ছিল।

তাহলে মরাল অফ দ্য স্টোরি যা দাঁড়াল - যাওয়া আসার ট্রেনের টিকিট কাটা থাকলে শ্রেফ মনের জোরেই শুধু মাত্র জায়গার নাম শুনে পাহাড় পর্যন্ত জয় করে আসা যায়। তাই না?



© Debasjit Bhowmick

~ স্থিতিধর টেক রুটম্যাপ ~ স্থিতিধর টেকের আরো ছবি ~

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেল বায়োলজি বিভাগের রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট দেবজিৎ ভালোবাসেন বই পড়তে, ফটো তুলতে আর সময় পেলেই ট্রেকিং-এ বেরিয়ে পড়তে।



কেমন লাগল :

Like Be the first of your friends to like this.

a Friend

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00



= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আ. জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর

ইতিহাসের তীর্থভূমি অমৃতসর

অদিতি ভট্টাচার্য্য

[অমৃতসরের তথ্য](#) || [অমৃতসরের আরো ছবি](#)

"পঞ্চনদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মস্ত
জাগিয়া উঠেছে শিখ -
নির্মম নিভীক।"

অমৃত সরোবরের ধারে দাঁড়িয়ে অপর পাড়ে সূর্যের আলোয় ঝলমল করা সোনালি হরমন্দির সাহিবকে প্রথমবার দেখে সেই ছোটবেলায় পড়া ক'টা লাইনই কেন জানি না মনে পড়েছিল। হরমন্দির সাহিব মানে ভগবানের মন্দির, আমরা সবাই যাকে চিনি স্বর্ণমন্দির নামে। শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জুন ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির তৈরির কাজ শুরু করেন। পরে ১৬০৪ সালে আদি গ্রন্থকে এখানে স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে দশজন শিখ গুরুর বাণী সম্বলিত হয়ে এই আদি গ্রন্থই গুরু গ্রন্থ সাহিব নামে খ্যাত হয়। অমৃত সরোবর অবশ্য তারও অনেক আগেই খনন করা হয়েছিল, করেছিলেন চতুর্থ গুরু রামদাস। অমৃত সরোবর থেকে এর আশেপাশের অঞ্চলের এবং পরবর্তীকালে গড়ে ওঠা শহরের নাম হয় অমৃতসর। ধর্মপ্রাণ মানুষের বিশ্বাস ব্যাধি নিরাময়ের অলৌকিক ক্ষমতা আছে এই সরোবরের জলের।

মহাষ্টমীর রাতে পৌঁছেছিলাম অমৃতসরে। পরেরদিন সকাল থেকেই ছিল ব্যস্ততা ঘুরে বেড়ানোর। আর এই ঘুরে বেড়ানোর তালিকায় এক নম্বরেই ছিল স্বর্ণমন্দির। স্বর্ণমন্দির সম্পর্কে প্রথমেই যেটা বলতে হয়, যা দেখে মুগ্ধ হয়েছি তা হল প্রচুর জনসমাগম সত্ত্বেও এখানকার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। ঢোকান মুখেই রয়েছে একটি অগভীর জলাধার যেখানে পা ধুয়ে প্রবেশ করতে হয়। প্রবেশের আগে নারী পুরুষ নির্বিশেষে মাথা আবৃত করতে হয়। ঢুকেই একটু গিয়ে অমৃত সরোবর, যার চারদিকে মার্বেলে মোড়া রাস্তা। অনেকেই সরোবরের জল মাথায় স্পর্শ করাচ্ছেন, স্নান করছেন। জল পড়ে মার্বেলের মেঝে যাতে পিচ্ছিল না হয় তার জন্যে মোটা দড়ির কার্পেট পাতা রয়েছে। প্রবেশপথ



সরোবরের যেদিকে হরমন্দির সাহিব তার বিপরীতে। কাজেই একদিক থেকে যাত্রা শুরু করে হরমন্দির সাহিব দর্শন করে অপর দিক দিয়ে বেরোলে অমৃত সরোবরকে পরিক্রমা করা হয়ে যায়। সরোবরটি যথেষ্ট বড়ো এবং চতুরটি বিশাল। হরমন্দির সাহিবের আশেপাশে সরোবরের ধার দিয়ে আরো গুরদোয়ারা আছে, সেখানেও সব সময় গুরু গ্রন্থসাহিব পাঠ হচ্ছে। যেতে যেতে এসব দেখতে দেখতে একটা অদ্ভুত ভালো লাগার অনুভূতি হয়।

সেদিন ছিল রবিবার এবং দুর্গাপূজার মহানবমী। স্থানীয় দর্শনার্থী ছাড়াও আমাদের মতো বাইরে থেকে আসা ভ্রমণার্থীদের সংখ্যাও প্রচুর। স্বাভাবিকভাবেই হরমন্দির সাহিবের ঢোকান লম্বা লাইন। দেখলাম অনুরোধ করলে বয়স্ক ব্যক্তিদের বা যাঁরা শারীরিক কারণে অনেকক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে অক্ষম তাঁদের দ্রুত দর্শন করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হরমন্দির সাহিবের ঢোকান দরজা চারদিকে চারটি। জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলের অব্যাহত দ্বার বোঝাবার জন্যেই নাকি এই চার দুয়ারের নির্মাণ। তেতরে গুরু গ্রন্থসাহিব অধিষ্ঠিত, সুন্দর কারুকার্যময় চাদরের নীচে। দুপাশে দুজন চামর দোলাচ্ছেন, একজন বসে পড়ছেন। মেঝেতে মোটা কার্পেট পাতা। দেওয়ালের কারুকার্য মনোমুগ্ধকর। দর্শনার্থীরা ঢুকছেন, অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন, অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, অনেকে বসেও আছেন। কোনো ঠেলাঠেলি নেই, কোলাহল নেই, সুন্দর শান্ত ভাবগস্তীর পরিবেশ। সত্যিই মন ভরে যায় এখানে এলে। দোতলায় অকাল তখত, গুরু গ্রন্থসাহিবের রাত্রিকালীন আবাস। প্রতিরাতে সোনার পালকিতে করে বাদ্য সহকারে তাঁকে ওপরে নিয়ে যাওয়া হয়। আবার ভোররাতে নামিয়ে আনা হয় একইভাবে। আরও ওপরে আছে মিউজিয়াম। বর্তমানে যে হরমন্দির সাহিব আমরা দেখি তা ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তৈরি। পরে আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সংস্কার করা হয়। উনিশ শতকের প্রথমদিকে মহারাজা রণজিৎ সিংহ একে সোনায় আবৃত করার কাজ শুরু করেন।

স্বর্ণমন্দিরের লঙ্গরখানার কথা উল্লেখ না করলে বর্ণনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। রোজ হাজার হাজার মানুষ এখানে আহার গ্রহণ করেন। রীতিমতো বিশাল আয়োজন প্রতিদিনই। রুটি তৈরির মেশিন রয়েছে যা দিয়ে প্রতি ঘন্টায় হাজারের ওপর রুটি বানানো হয়। ধর্মপ্রাণ শিখরা নারী পুরুষ নির্বিশেষে এখানে শ্রমদান করে পুণ্য অর্জন করেন। সে লঙ্গরখানায় রান্না করে, এঁটো বাসন মেজে, গুরদোয়ারা কাঁট দিয়েই হোক কী দর্শনার্থীদের জুতো রাখার ব্যবস্থা করেই হোক।

পরের গন্তব্য জালিয়ানওয়ালা বাগ। হ্যাঁ ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা সেই জালিয়ানওয়ালা বাগ যেখানকার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইট উপাধি ত্যাগ করেছিলেন। সেই সরু গলিটা দিয়েই ঢুকলাম, যেখানে দুজন পাশাপাশি ভালোভাবে হাঁটতে পারে না। জালিয়ানওয়ালা বাগে ঢোকা বা বেরোনার এই একটাই রাস্তা ছিল তখন আর এই রাস্তাটাকেই বন্ধ করে জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে নির্বিচারে গুলি চালান হয়েছিল এখানে সমবেত মানুষের উদ্দেশ্যে। ছুড়েছড়িতে কতজন পড়ে গেছিল, গুলি থেকে বাঁচার জন্যে কতজন কুয়োতে ঝাঁপ দিয়েছিল তার ঠিক ঠিকানা নেই। হাজার হাজার মৃতদেহ স্তপাকৃতি হয়েছিল সেদিন এখানে - ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল। চিহ্নিত করা আছে সেই জায়গা ঠিক যেখান থেকে গুলি চালান হয়েছিল। দেওয়ালের গায়ে আজও রয়েছে অসংখ্য গুলির চিহ্ন। মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে প্রজ্জ্বলিত রয়েছে অমর জ্যোতি। যদিও অত্যন্ত দুষ্টিকটুভাবে সেই জ্যোতির দ্বাধারে দাঁড়িয়ে ফটো তোলায় হিড়িক চোখে পড়েছে। এক শিখ যুবকের আক্ষেপ, ছবি তোলায় যত উৎসাহ তার অর্ধেকই ইতিহাস জানার জন্যে নয়। বাগানটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে সংরক্ষিত। মিউজিয়ামও আছে, তাতে আছে এই সময়কার আলোকচিত্র যা দেখলে মন আরও ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। স্বর্ণমন্দির আর জালিয়ানওয়ালা বাগ দেখতে দেখতেই দেখি ঘড়ির কাঁটা দুটোর আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে। অতএব তাড়াতাড়ি জঠরাগিকে শান্ত করে ওয়াঘার



উদ্দেশ্যে দৌড়। সেখানে আবার প্রচণ্ড ভিড় হয় এবং অনেক আগে থেকে না গেলে নাকি রিট্রিট সেরিমিনি দেখার কোনো আশাই থাকে না। আর এবার তো সুনলাম অমৃতসরে রেকর্ড ভিড় হয়েছে। ওয়াঘা বর্ডার ভারত আর কাশ্মীরের মধ্যে একটি রোড বর্ডার। গ্র্যাণ্ড ট্রান্স রোডের ওপর এই বর্ডার। ওয়াঘা নামে একটি গ্রামের ওপর দিয়ে এই সীমা রেখা যা র্যাডক্লিফ লাইন নামে ইতিহাসে পরিচিত সেটি গেছে। এই গ্রামটির একাংশ বর্তমানে ভারতে এবং অপরাংশ পাকিস্তানে। ওয়াঘা থেকে লাহোরের দূরত্ব বাইশ কিলোমিটার এবং অমৃতসরের আঠাশ কিলোমিটার।

বর্ডারের অনেক আগেই গাড়ি পার্কিং-এ ছেড়ে দিতে হয়। রিকশা করে কিছুদূর যাওয়া যায়। তারপর সিকিউরিটি চেকিং এর পর বেশ খানিকটা হাঁটতে হয়। মাঝখানে জি টি রোড, দুপাশে মানুষের ঢল। জি টি রোডের দুপাশেই গ্যালারি। সেখানে তখন তিল ধারণের স্থান নেই, যদিও আমরা সূর্যাস্তের প্রায় আড়াই ঘন্টা আগে পৌঁছেছি। যাই হোক অনেক

ধাক্কাটাক্কা খেয়ে গ্যালারির ওপর দিকে কোনো মতে দাঁড়াবার একটু জায়গা পেলাম। ভালো করে তাকাতেই অবাক! এই তো চওড়া জি টি রোড চলে গেছে, ওই তো একটা গেট আর গেটের ওপারে পাকিস্তান! ওইতো ওদের সাদা সবুজ রঙের গ্যালারি দেখা যাচ্ছে। একেবারে যেন হাতের মধ্যে। রাস্তায় তখন অনেকে ভারতের জাতীয় পতাকা নিয়ে দৌড়ছে, একেবারে গেট অবধি যাচ্ছে। দেশাত্মবোধক গান বাজছে, ভিড়ের মধ্যে থেকেও প্রচুর তিরঙ্গা উড়ছে। মুহূর্তে ধ্বনি উঠছে 'বন্দে মাতরম,' 'জয় হিন্দ,' 'হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ।' মজার ব্যাপার আমাদের এদিকে এত ভিড়, ওপাশে পাকিস্তানের গ্যালারিতে গুটিকয়েক লোক। প্রতিদিন সূর্যাস্তের আগে ওয়াঘা বর্ডারে রিট্রিট সেরিমিনি হয়। গেট খুলে যায় কিছুক্ষণের জন্যে। প্যারেড করে আমাদের বি এস এফের জওয়ানরা



গেট অবধি যায়, ওদিক থেকে পাকিস্তানের সেনারা আসে। একসঙ্গে দুদেশের পতাকা নামানো হয় সেদিনের মতো। পতাকা সুন্দর করে ভাঁজ করে নিয়ে আসা হয়। প্যারেডেও বেশ অভিনবত্ব আছে। এটা দেখতেই মানুষের ঢল। একটা সময় যখন গেট খোলা ছিল তখন আর দুটো দেশ যেন মনে হচ্ছিল না, শুধু দেখা যাচ্ছিল একটা চওড়া সোজা রাস্তা আর আর তার দুপাশে শুধু মানুষ। পতাকা নেমে গেল, অনুষ্ঠান শেষ হল, সূর্যও ডুবল ওয়াঘা সীমান্তে। প্রতিদিন ঘড়ির কাঁটা ধরে এই অনুষ্ঠান হয়। ভিড় বেশি হয় অনুষ্ঠানের সময়েই, দিনের অন্য সময় ফাঁকি থাকে। ইচ্ছে করলে অন্য সময় এসে ফাঁকায় ফাঁকায় সীমান্ত দেখে নেওয়া যায়।

দিনের শেষে অমৃতসর দর্শন সেরে আমাদেরও হোটেলে ফেরার পালা।

স্বর্ণমন্দির, জালিয়ানওয়ালা বাগ, ওয়াঘা - সব মিলিয়ে এক পরিপূর্ণ মনে পরের দিন বিদায় জানালাম ছোটবেলার বইয়ের পাতার বড় চেনা ইতিহাসের তীর্থভূমি অমৃতসরকে।

[অমৃতসরের তথ্য](#) || [অমৃতসরের আরো ছবি](#)

সংখ্যাতত্ত্ববিদ অদিত্য কাছের বই আর অঞ্জলি সমতুল্য। কর্মসূত্রে আরব দুনিয়ায় বসবাসের অভিজ্ঞতাও আছে। ভ্রমণ, ছবি তোলা, এন্ড্রয়ডারির পাশাপাশি ইদানীং লেখালিখিতেও সমান উৎসাহী। নানান ওয়েব ম্যাগাজিন (আসমানিয়া, জয়ঢাক, পরবাস, মাধুকরী, গল্পকবিতা ডট কম) ও আরো দু একটি পত্রপত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়।



কেমন লাগল :

Like Be the first of your friends to like this.

tell! a Friend

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00



বেড়ানোর কথা
আর ছবি নিয়ে
বাংলা
ই-ম্যাগাজিন

আমাদের বাসনা

আমাদের দেশ

আমাদের পৃথিবী

আমাদের কথা

G

Q

= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আ. র্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পঠালোর আমন্ত্রণ রইল =

যেখানে ঢেউ ওঠে লবণ হুদে

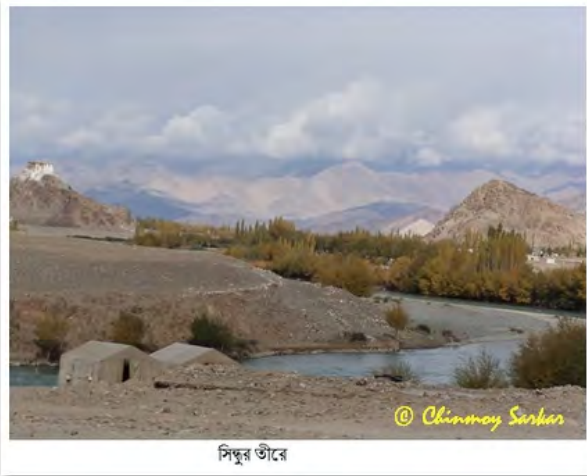
সুমিতা সরকার

~ লাদাখের তথ্য ~ লাদাখের ছবি ~ লাদাখের ছবি ~

এয়ার ইন্ডিয়ান বিমান সেবিকার কঠোর কানে ভেসে আসতে না আসতেই দেখি সিটের সামনের স্ক্রীনে ভেসে উঠেছে লে শহরের নাম - আমরা পৌঁছে গেছি। জানলা দিয়ে চোখে পড়ছে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বরফ ঢাকা পর্বতশ্রেণী। চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা সেই ছোট্ট এয়ারপোর্টে নামছে আমাদের বিমান। সত্যি সত্যি নিজের গায়ে ব্যথা দিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছিল এটা আদৌ স্বপ্ন নাকী বাস্তবই - এই সেই অপার সৌন্দর্যে মোড়া চির রহস্যের দেশ লাদাখ। হ্যাঁ সত্যি, স্বপ্ন নয় সত্যি।

বহুদিন ধরেই ইচ্ছে ছিল লাদাখ যাবার কিন্তু কাশীর হয়ে গাড়িতে লাদাখ পৌঁছতে তিন থেকে চার দিন লাগে। আমার এবং কর্তার কষ্টের কথা ভাবিনা, কিন্তু সঙ্গে যে আছে আমাদের ছোট্ট রোশনি, আমার মেয়ে। সেও বেড়াতে খুব ভালবাসে। কিন্তু অতিরিক্ত উচ্চতার কষ্টের কথা ভেবেই লাদাখ যাবার পরিকল্পনা বারবারই পিছিয়ে দিচ্ছিলাম। সেই সময় হঠাৎ মনে হল যদি দিল্লি থেকে প্লেনে লে যাই তাহলে হয়তো পথের সৌন্দর্য কিছুটা কম দেখব কিন্তু আমাদের আনন্দ আমার ছোট্ট মেয়ের কষ্টের কারণ তো হবেনা। ব্যস, নবমীর সকালে দিল্লির ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে চড়ে বসলাম বিমানে। পৌঁছে গোলাম লে। চারদিকের নানা রঙের পাহাড় যেন হাত ধরাধরি করে আগলে রেখেছে শহরটাকে। সব পাহাড়ই যেন হাত ছোঁয়া দূরভে। আমরা বাক্য হারা। যে আমি এক সেকেন্ড কথা না বলে থাকতে পারি না, সেই আমিও ঘোরের মধ্যে দিয়ে চেকিং পর্ব সেরে কখন যে এয়ারপোর্টের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি টের পাইনি।

হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের এবারের সফরসঙ্গী "করমা ভাইয়া"। অসম্ভব ভালো - যেমন বিনয়ী, তেমনি মিতকে আর তার সঙ্গে পরম সাহায্যকারী। লাদাখে প্রিপেড কানেকশন চলে না। উপায়? ভরসা সেই করমাই। দিয়ে দিল আন্ত একটা মোবাইলই। অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম খানিকক্ষণ। উত্তরে পেলাম এক গাল হাসি। চটপট উঠে পড়লাম গাড়িতে। অক্টোবর মাস হলেও লে শহরে বেশ ভালো ঠাণ্ডা - দিনের বেলাতেই ৮-৯ ডিগ্রি। ধীরে ধীরে গাড়ি ঢুকল শহরে। হোটেল, দোকান- বাজার, বাড়ি দিয়ে সুন্দর করে সাজানো পাহাড়ি শহর। তবে চরিত্রের দিক থেকে সিমলা কী দার্জিলিং সবার থেকে আলাদা। অনেক হোটেলেরই নিজস্ব ছোট ছোট কিচেন গার্ডেন আছে। আমরা যে হোটেলটায় উঠেছিলাম সেটা বাজারের একদম কাছেই। ঘরে দেওয়াল জোড়া কাঁচের জানলা। পর্দা সরতেই দেখা যাচ্ছে বরফ ঢাকা পর্বতশ্রেণী। আর নীচের তাকালেই চোখে পড়ছে বাগান জুড়ে বাঁধাকপি, শাকসবজি তার সঙ্গে আপেল গাছ থেকে গোলাপ গাছ সবই। ভাবা যায় না। সত্যি বলতে কী হোটেলের ওই জানলাটা আমার চোখের ও মনের দুইয়েরই রসনা পরিতৃপ্ত করছিল।



সিন্দুর তীরে

পরেরদিন সকাল সাতটায় আমরা বেড়িয়ে পড়লাম প্যাংগং লেকের উদ্দেশে। প্রথমে খানিকটা পথ শহরের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম দুধারে সুন্দর সুন্দর বাড়ি, হোটেল আর তার সঙ্গে লাগোয়া বাগান। ধীরে ধীরে শহর ছেড়ে গাড়ি বেড়িয়ে পড়ল যে রাস্তায় তার দু'ধারে রক্ষ প্রান্তর, দূরে কারাকোরাম শৃঙ্গের সারি। এক এক শৃঙ্গ এক এক রঙের, কিন্তু অদ্ভুত তাদের গায়ে কোন গাছপালা নেই। সেই রক্ষ সৌন্দর্য যেন এক অজানা পৃথিবীতে পৌঁছে দিয়েছিল। সেই অজানা প্রান্তরে কিছুক্ষণ গাড়ি চলার পর হঠাৎ শুরু হল এক নীল নদের পথ চলা। জানতে পারলাম এই হল ইতিহাস প্রসিদ্ধ সিন্দু নদ। যার নীল জলের হাত ছানিতে সাড়া দিয়ে আমরা তিনজনেই তার কাছে উপস্থিত। হাত দিয়ে ছুলাম তাকে, মনে হল যেন পৌঁছে গেছি অতীত কালে, হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই এখন দিয়ে একদল শক অথবা হুণ সৈন্য ঘোড়া চালিয়ে ছুটে যাবার পথে ঘোড়াকে জল খাওয়াতে দাঁড়াবে। কিন্তু সেই সুন্দর অনুভূতিকে দূরে সরিয়ে করমা ভাইয়ার ডাকে আবার গিয়ে উঠলাম আমাদের বর্তমান যুগের যন্ত্রযানে।

পথে দেখা হল লাদাখের অতি পুরাতন গুম্ফা হেমিস। কিন্তু

দরজা বন্ধ থাকার জন্য বাইরে থেকেই চোখের পিপাসা মিটিয়ে এগিয়ে গেলাম। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই পৌঁছতে হবে সেই রহস্যময়ীর কাছে - যার নাম প্যাংগং লেক। পথে পড়ল ছোট্ট গ্রাম কার।

যেহেতু রাস্তায় কোন হোটেল নেই তাই গাড়িতে ওঠার সময় কিছু কেক, বিস্কুট, বাদাম, চকলেট কেনা হয়েছিল। সেই বিস্তীর্ণ ধূধে প্রান্তরে করমা ভাইয়ার গাড়ির লাদাখি সঙ্গীত আর মুখরোচক খাবার লাদাখের প্রাকৃতিক দৃশ্যকে আরও মনোরম করে তুলেছিল। এখানে পাহাড়ের গায়ের রঙে সোনালি আভা। পথের বাঁ দিকে পাহাড়ের মাথায় চোখে পড়ল একটি গুম্ফা। জানা গেল এটি চারশো বছরের পুরাতন চেমডে গুম্ফা। এরই মাঝে এল পাহাড় ঘেরা আরেক এক ছোট্ট গ্রাম নাম শাকতি।

এর পর ধীরে ধীরে আমাদের গাড়ি পাহাড়ের পর পাহাড় টপকাতো লাগলো। প্রথমে দেখলাম পথের ধারে অল্পসল্প বরফ পড়ে আছে, চোখের পলক পড়তে না পড়তেই দেখি চারদিকে শুধুই সাদা বরফ আর দূরে দেখা যাচ্ছে চাংলা পাস। হঠাৎ করমা ভাইয়া গাড়ি থামিয়ে দিল। দেখলাম গাড়ির পিছন থেকে বেরিয়ে এলো লোহার চেন, লাগানো হল গাড়ির চাকায। এই সময় দেখি কিছু গাড়ি ফেরত আসছে। করমা ভাইয়া তাদের প্রশ্ন করে জানলো সামনে বরফ পড়ে রাস্তা প্রায় বন্ধ। তবে মিলিটারি ভাইরা রাস্তা পরিষ্কার করছে, সময় লাগবে। আমার কর্তা মহাশয় খুবই চিন্তিত, আগে এগোবে না আজ ফিরে যাবে।

অদ্ভুত আমাদের চালক, তার কপালে সামান্য চিন্তার স্বেদবিন্দুও জমেনি, তার কথায যদি আমরা এগোতে রাজি থাকি সে ঠিকই পৌঁছে দেবে। খানিকটা এগিয়ে দেখি সার সার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। দূরে বাঁকের কাছে ক্রেন দিয়ে বরফ পরিষ্কার করার কাজ চলছে। যাইহোক, কিছুক্ষণের মধ্যেই রাস্তা পরিষ্কার হোল, চলতে শুরু করল গাড়ি। বললে ভুল হবে না, যখন এই বরফ ঢাকা সরু পথ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছিল মনে হচ্ছিল আমাদের নিজেদের হুৎপিণ্ডের স্পন্দন

নিজেরাই শুনতে পাচ্ছি। ধীরে ধীরে গাড়ি পৌঁছল তুষার ঢাকা চাংলা পাস - উচ্চতা ১৭০০০ ফিট।

চাংলা বাবার মন্দিরে নানা রঙের প্রার্থনা পতাকা উড়ছে। এখানে একটি মিলিটারি ক্যাম্পও আছে। আমাদের চালক লে শহর থেকে করে আনা পারমিট চাংলা পৌঁছানোর আগেই কারু চেকপোস্টে জমা দিয়েছিল। মিলিটারি ভাইরা এতটাই ভালো, আমাদের সঙ্গে ছোট্ট মেয়ে দেখে নিজেরাই ও ঠিক আছে কিনা খোঁজ নিল। তারপর নিজেদের থেকে ওষুধও দিল, যাতে কষ্ট না হয়। তবে আমি তখন চাংলার সাদা পেন্ডো তুলোর মতো বরফ ঢাকা রূপে আত্মবিশ্বাস, গাড়ি থেকে নেমে পায়ে পায়ে দাঁড়ালাম বরফের ওপর। কিন্তু ওই যে আমার আবার ছটফটে স্বভাব, না দেখে পা দিয়েছি শক্ত বরফের ওপর। ব্যাস পপাত ধরনীতলে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়েছি, চারদিক দেখছি কেউ দেখেনি তো, ও মা দেখি মেয়ে আর কর্তা দুজনেই সাক্ষী এবং ফিকফিক করে হাসছে! আর কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা গাড়িতে। আমরা ছাড়াও ছিল কিছু বিদেশি টুরিস্ট, লাদাখি গ্রামবাসী আর মিলিটারি সৈন্য। যেদিকেই চোখ রাখি মনে হয় সব দৃশ্যই ক্যামেরায় বন্দি করি। কিন্তু আমার কর্তার ভাষায় কিছু দৃশ্য মন-ক্যামেরায় তুলে রাখতে হয়।



চাংলা পাসের পথে

যাইহোক করমা ভাইয়া আবার গাড়ি চালাতে শুরু করলো। পাস থেকে নামার মুখে হঠাৎ দেখি করমা ভাইয়া গাড়ি ধামিয়ে এক দৌড়ে সামনের গাড়ির একপাশ ধরে উঠে পড়ল সঙ্গে আরও কয়েকজন লাদাখি। ভালো করে দেখে বুঝলাম জিপটা আরেকটু হলেই গড়িয়ে খাদে নেমে যাচ্ছিল। আমাদের চোখে না পড়লেও করমা ভাইয়ার অভিজ্ঞ চোখ সেই বিপদকে দেখতে পেয়েছিল তাই তার এই চেষ্টা এবং সত্যি জিপটি ধীরে ধীরে রাস্তায় উঠে এল। দুহাতের ধুলো বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে সে যখন আবার চালকের আসনে বসল তখন তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কিছুই হয় নি। ধীরে ধীরে রাস্তার দুধারের বরফ কমতে লাগল এবং আমরা পাহাড় ছেড়ে নেমে এলাম উপত্যকায় যেখানে লম্বা রাস্তার দুধারে ধু ধু প্রান্তর। ধীরে ধীরে সামনে এল ছোট্ট একটা গ্রাম নাম তাংসে (উচ্চতা ১৩০০০ ফিট)। করমা ভাইয়া বলল এখানে কিছু খাবার খেয়ে নিতে। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি অনেকেই প্যাংগং দেখে ফিরে এখানেও রাত কাটান। সামনের একটা ছোট্ট সুন্দর বাড়িতে ভাইয়া আমাদের নিয়ে গেল। তাদের খাবার ঘরে এল গরম গরম মোমো, ধোঁয়া ওঠা লাল চা আর চাউমিন। আমি তো খুব খুশি, মেয়েও দেখি আবার ভাত ডাল সবজিও এল। আমরা তখন পরস্পরের দিকে অবাক নয়নে দেখছি। যাঃ বাবা, এত খাওয়া যায় নাকি? প্রশ্ন করতে জানা গেল, যেহেতু আমরা বাঙালি তাই ভাতেরও ব্যবস্থা। উফ, এই ঠাণ্ডায় গরম ভাত, চাউমিন সব তখন অমৃতের মতো। চটপট খাওয়া সেরে আবার গাড়িতে উঠে বসলাম। তাংসে থেকে প্যাংগং প্রায় ৩৫ কিমি। হঠাৎ নিজের পুষ্টিগত বিন্দ্য যাচাই করার ইচ্ছা হোল। করমা ভাইয়াকে প্রশ্ন করলাম পথে তো লুকুং নালা পড়বে, সেখানে কি জলে ভরে যাবে? তবে আমরা যাব কী করে? কী বুঝল জানি না, তবে জানালো এখন কোন অসুবিধা নেই। চোখ পড়ল দুপাশের পাহাড়ে, দেখি কোনোটা লাল তো কোনোটা খয়েরি আবার কোনোটা বা কালো। যেন এই মাত্র হোলি খেলা হয়েছে পাহাড়ে পাহাড়ে। হঠাৎ দূরে দেখি ফাগে রান্ধা পাহাড় গুলির ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে কোন এক অপরূপ সর্বজ মসলিনের আঁচলের অংশ। বুঝলাম এই সেই অপার্থিব সুন্দরী প্যাংগং সো-র এক বলক।

সেই এক বলক সৌন্দর্যকেও ক্যামেরা বন্দী করে ফেলল আমার কর্তাটি। আমি তখন ঠেংয়ের শেষ সীমায়, আর কতক্ষণ লাগবে ওই রূপসীর কাছে পৌঁছতে? জানা গেল মিনিট কুড়ি। এবার গাড়ি ধীরে ধীরে নামতে শুরু করলো এবং আরও একটা দুটো পাহাড়কে ভেদ করে তৈরি করা রাস্তা দিয়ে নামতেই সামনেই বিস্তৃত প্যাংগং সো।



প্যাংগং সো - প্রথম দর্শনে

গাড়ি নেমে এল লেকের ধারে। লেকের জলে সর্বজ ও নীল রঙের মেলামেশা। জোরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্রাহ্মণী হাঁস। চ্যাং চেনমো পর্বতশ্রেণী ঘিরে আছে এই হ্রদকে। এই হল ১৪০০০ ফিট উচ্চতায় অবস্থিত স্বর্গীয় লেক, যা প্রস্থে ৬ থেকে ৭ কিমি, দৈর্ঘ্যে ১৩০ কিমি। এর তিন ভাগ চিনে এক ভাগ ভারতে। তবে সৌন্দর্য মনকে ভরিয়ে তুললেও শরীর তখন ক্লান্তিতে ভরে উঠেছে। হ্রদের ধার দিয়ে দিয়ে ডানদিকে পাহাড়ের গা বেয়ে সাত কিলোমিটার দূরে হ্রদের তীরেই রয়েছে স্পাংমিক গ্রাম। তারই কিছুটা আগে রয়েছে মারতসেমিক ক্যাম্প। সেখানেই আমাদের বুকিং ছিল। গাড়ি পৌঁছে দিল সেই ক্যাম্পে। তবে শুনতেই ক্যাম্প, কোন পাঁচ তারা হোটেলের থেকে কম নয় সুযোগ সুবিধা। বিদ্যুৎ নেই, জেনারেটরই ভরসা। ক্যাম্পে ঢুকে আমরা প্রথমে রিফ্রেশ হতে হতেই চলে এল কফি। কফির কাপ হাতে বাইরে বেরিয়ে দেখি পাশের ক্যাম্পে উঠেছে দুজন ছটফটে বিবাহিত তরুণতরুণী। আলাপ করতে জানতে পারলাম ওদের গাড়িটাই খাদে নেমে যাচ্ছিল। ওরাও বাঙালি। জমে

উঠল আড্ডা। সন্ধ্যা নেমে এল প্যাংগং এর বুক। আকাশে তখন পূর্ণিমার চাঁদ। জ্যোৎস্নায় চিকচিক করছে লেকের জল। সেই সৌন্দর্যকে অনুভব করতে করতেই টুপ টাপ করে বরফ পড়া শুরু হল। কর্তার আদেশে কন্যাসহ তাঁবুতে ফিরলাম। তিনি কিন্তু ক্যামেরা হাতে ঝিলের ধারে ঘুরে এলেন এবং দেখালেন চাঁদের আলোয় তোলা ঝিলের আধো আলো আধো আঁধারের ছবি। অপূর্ব সেই দৃশ্য।

লেপের তলায় ঢুকে কন্যা তখন তার বাবার সঙ্গে সারাদিনের অভিজ্ঞতার গল্প করতে ব্যস্ত, এমন সময় ক্যাম্পের ম্যানেজার এসে জানালো খেতে যেতে হবে ওদের ডাইনিং হলে। একটুও বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। কিন্তু কী আর করব জ্যাকেট চড়িয়ে পৌঁছালাম খাবার জায়গায়। চিনা লর্ডন দিয়ে সুন্দর করে সাজানো বেশ বড় একটা তাঁবু। আর খাবার? স্যুপ থেকে চিকেন কারি সবই প্রস্তুত। কিন্তু খাবার লোক বলতে আমরা পাঁচজন। যাইহোক সুস্বাদু খাদ্য আর বাঙালির আড্ডায় জমে গিয়েছিল ওদের ডাইনিং হল। ম্যানেজারের কাছ থেকে জানা গেল সবকিছুই আসে লে শহর থেকে। গ্রীষ্মকালে এখানে বার্লি আর কড়াই গুঁটির চাষ হয়। পশমিনা ভেড়ারও চাষ হয় এখানে। এই গ্রামের অধিবাসীদের চাংপা বলে। আড্ডা শেষে সোজা তাঁবুতে ঢুকে লেপের তলায়।

সকালে ঘুম ভাঙল কর্তার হাঁকডাকে। তাঁবুর বাইরে পা দিতে গিয়েই দেখি চারদিক নরম সাদা বরফ ঢেকে গেছে। আকাশ পরিষ্কার। নীল সাদা মেঘেরা ভেসে বেড়াচ্ছে। চটপট তিনজনে নেমে গেলাম লেকের ধারে। লেকের বিপরীত দিকের পর্বত শ্রেণী বরফে ঢেকে গেছে। যেদিকেই তাকাই শুধু সাদা বরফ। কিন্তু ঝিলের জলে এক ফোঁটাও বরফ নেই। আর আশ্চর্য এই ঝিলা। এর জলে সমুদ্রের মতো ঢেউ ওঠে। ক্ষণে ক্ষণে রংও বদলায়, কখনো নীল কখনও সবুজ। আবার কখনও দুটি রঙই হাত ধরাধরি করে থাকে। খানিকক্ষণ শুধু ক্যামেরার সাটার টেপার শব্দটুকু ছাড়া সব শব্দই নিজের কানে উদ্ভূত ঠেকছিল। বুঝতে পারছিলাম না কী বিশেষণ দেব এই সৌন্দর্যকে। অপূর্ব, অপার্থিব, অসাধারণ, স্বর্গীয় - ব্যাস আমার দৌড় শেষ। কিন্তু প্যাংগং সো-র সৌন্দর্য সব বিশেষণের উর্দে। যা শুধু চুপচাপ ঝিলের ধারে দাঁড়িয়ে অনুভব করা যায়। ভাষায় প্রকাশ করা বোধ হয় যায় না।

তারপর আর কী আবার ধীরে ধীরে ক্যাম্পে ফেরা। খাবার জায়গায় গিয়ে দেখি এলাহি ব্যাপার। আলুর পরোটা, বাঁধাকপির পরোটা, ডিমের ঝুরি ভাজা, কর্নফ্লেক্স দুধ, পরিজ, আরও কত কী। কিন্তু এবার ফেরার পালা তাই দুধ কর্নফ্লেক্স দিয়েই প্রাতঃরাশ সারা হোল। এর মধ্যেই করমা ভাইয়া গাড়ি নিয়ে প্রস্তুত। বিদায় নেওয়ার আগে লেকের ধারে চেয়ার পেতে বসে সবাই মিলে কফি খাওয়া হোল। এবার বিদায় নেওয়ার পালা পরস্পরের থেকে আর অবশ্যই তাদের থেকে যারা এই জনশূন্য জায়গায় অপেক্ষা করে থাকে আমাদের জন্য সেই ম্যানেজার দাদা আর তার সঙ্গীরা। আর একবার লেকের ধারে গাড়ি নিয়ে ঘুরে লেকের জলে হাত ছুঁয়ে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বিদায় জানালাম প্যাংগংকে।
গাড়ি রওনা দিল লে শহরের দিকে।

~ [লাদাখের তথ্য](#) ~ [লাদাখের ছবি](#) ~ [লাদাখের ছবি](#) ~



বরফে বিছানো প্যাংগং সো




নৃত্য বিশারদ সুমিতা ভালবাসেন বই পড়তে ও গান শুনতে। ঘর সামলানোর ফাঁকে অবসর আর সুযোগ পেলেই সপরিবারে বেড়িয়ে পড়েন অচেনা অদেখা প্রকৃতির অমোঘ টানে।



কেমন লাগল :

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

 Like Be the first of your friends to like this.

 te! a Friend   

[আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন](#)

To view this site correctly, please [click here to download the Bangla Font](#) and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher



গীর্ণ ত্রমপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পঠানোর আমন্ত্রণ রইল =

পাহাড়চূড়ার আতঙ্কের শেষে

দেবাশিস বিশ্বাস

~ ধৌলাগিরি পর্বতাভিযানের আরো ছবি ~

ফেসবুকে একটার পর একটা ম্যাসেজ জমছিল - আপনারা সুস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসুন। বসন্তদাকে ফিরে পেয়েছি, এত মানুষের শুভেচ্ছা রয়েছে সঙ্গে - মনে হচ্ছিল আবার সব ঠিক হয়ে যাবে...

ফিরে আসার বেশ কিছুদিন পরে বসন্তদার তেনজিং নোরগে পুরস্কার পাওয়ার মুহূর্তে বার বার মনে পড়ছিল সেই ভয়ঙ্কর রাতের কথা...।

ডায়েরির পাতা উল্টাই -

১৬ই এপ্রিল, মঙ্গলবার - কলকাতা থেকে ১৩ই এপ্রিল রওনা দিয়ে কাঠমাণ্ডু পৌঁছে সেখান থেকে বেণী হয়ে আজ দারবাং (উচ্চতা ১১১০ মি) পৌঁছেছি। গাড়ির রাস্তা এখানেই শেষ। কাল থেকে হাঁটা শুরু। এভারেস্ট, কাম্বনজঙ্গা, অন্নপূর্ণার পর আমাদের লক্ষ্য পৃথিবীর সপ্তম উচ্চতম শৃঙ্গ ধৌলাগিরি (৮১৬৭ মি/ ২৬,৭৯৫ ফুট)। বসন্তদা ছাড়াও এবারে সঙ্গী মলয়। আর বহুদিনের সাথী পেয়া শেরপাতো রয়েছে। আয়োজক সেই লোবেন এক্সপেডিশনই।

'ধৌলাগিরি' একটি সংস্কৃত শব্দ। ধবল অর্থ সাদা বা সুন্দর আর গিরি মানে পর্বত। মধ্য নেপালের বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র পোখরার উত্তরে অন্নপূর্ণা। অন্নপূর্ণার পশ্চিমে অর্থাৎ পোখরার উত্তর-পশ্চিমে ধৌলাগিরির অবস্থান। অন্নপূর্ণা আর ধৌলাগিরির মধ্যে দূরত্ব ৩৪ কিমি। আর এই দুই বিশাল শৃঙ্গের মাঝে পৃথিবীর গভীরতম গিরিখাত দিয়ে বয়ে চলেছে কালীগঙ্কী নদী। ধৌলাগিরি আরোহণের প্রচলিত পথ এই শৃঙ্গের উত্তর-পূর্ব গিরিশিরা বরাবর। ১৯৫০ সালে ফ্রান্সের পর্বতারোহী মরিস হারজগ ধৌলাগিরি আরোহণ করতে এসে উপযুক্ত কোন পথ খুঁজে না পেয়ে মত পালটে অন্নপূর্ণা অভিযান করতে যান এবং সফলও হন। এটাই প্রথম অন্নপূর্ণা আরোহণ। এরপর বেশ কয়েকটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯৬০ সালে এক সুইস-অস্ট্রিয়ান দল ১৩ মে প্রথম ধৌলাগিরি আরোহণ করে।

ধৌলাগিরি গিরিশ্রেণীতে ধৌলাগিরি ছাড়াও আছে ধৌলাগিরি - ২, ধৌলাগিরি - ৩, ৪, ৫, চুরেন হিমল, চুরেন মূল, পূর্ব, পশ্চিম, পুথা হিনচুলি, গুরজা হিমল ইত্যাদি শৃঙ্গ।

১৭ই এপ্রিল, বুধবার - সকাল সকালই ঘোড়া এসে হাজির। ঘোড়ার পিঠে মালপত্র তুলে শুরু হল হাঁটা মাগ্দি নদী বরাবর। গন্তব্য খামলা। মাগ্দি নদীর নামে এই জেলার নামও মাগ্দি। এই মাগ্দি নদীই বেণীতে গিয়ে কালীগঙ্কী নদীর সঙ্গে মিশেছে।

আশেপাশে বেশ কয়েকটা গ্রাম। তাই পথে লোকজনের দেখা মিলছে। দড়ির ব্রিজ দিয়ে নদী পেরিয়ে আবার এগিয়ে চলা। রাস্তার ধারে পাহাড়ি জলধারার জল পান করে তৃষ্ণা মেটানো হল। দিনের বেলাতেও একটানা কানে আসছে ঝি-ঝি-র ডাক।

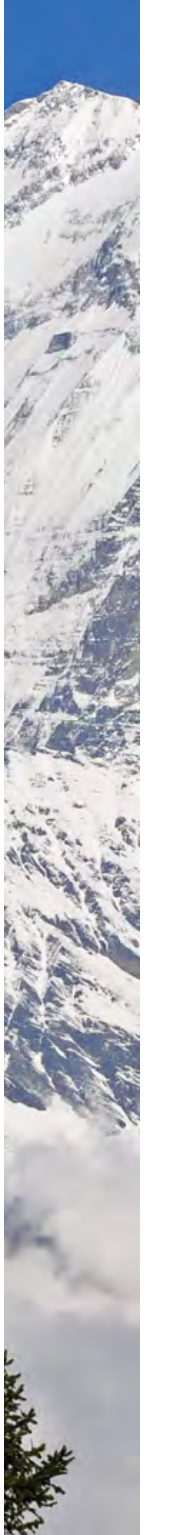
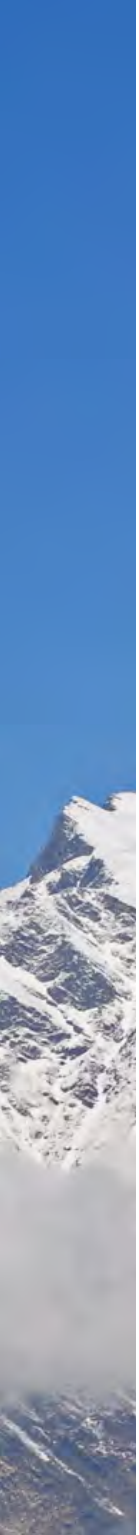
দুপুরবেলায় গ্রামের একটা বাড়িতে খাওয়ার জন্য থামা হল। তারপর আবার চলা। পথে চলতে চলতেই চোখে পড়ল একটা বাড়িতে শুয়োরের মাংস শোকানো হচ্ছে। অনেকটা খাড়া ঢাল পেরিয়ে বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ পৌঁছলাম খামলা। সেখানেই গ্রামের এক বাড়িতে রাতের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

১৮ই এপ্রিল, বৃহস্পতিবার - জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বেশ কিছুটা পথ পেরিয়ে মাগ্দি খোলার কাছে পৌঁছলাম। নড়বড়ে সেতু পেরিয়ে ওপারে ছোট গ্রাম দুগাপ। দু'একটা বাড়িঘর আর ছোট একটা চায়ের দোকান। চা-বিস্কুট খেয়ে আবার হাঁটা। পথে দেখা মিলল পোর্টারদের - খাবার বানানোর তোড়জোড় চলছে। লোকালয় শেষ। পাহাড়ের খাড়া ঢাল কাটা পথে হেঁটে বিকেলবেলায় পৌঁছলাম বোগারা। উচ্চতা ২০৮০ মিটার। চামের জমির মাঝে মাঝেই দু'একটা বাড়ি, হোটেল। অন্যান্য অনেক অভিযাত্রীর দেখাও মিলল। আমাদের তাঁরুও পড়ল এখানে।

১৯ এপ্রিল, শুক্রবার - চামের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর খাড়া চড়াই শুরু হল। ডানহাতে অনেক নীচে মাগ্দি খোলার জল দেখা যাচ্ছে। রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানে বসে অল্প বিশ্রাম নিয়ে আবার পথ চলা। এবারে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগোনো। জঙ্গলের মাঝে ছোট একটা ফাঁকা জায়গায় চোখে পড়ল একটিমাত্র দোকান। এখানে দেখা হল স্পেনের দু'জন অভিযাত্রীর সঙ্গে। দুপুর বারোটো নাগাদ পৌঁছলাম দোবান, উচ্চতা ২৫১০ মিটার। এখানে পাশাপাশি পাথরের তৈরি দু'তিনটে হোটেল রয়েছে। সামনে বেশ খানিকটা ঘাসের সমতল ময়দান - আমাদের তাঁরু পড়ল সেখানে।

২০ এপ্রিল, শনিবার - সকাল সাতটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। কাঠের সেতু দিয়ে মাগ্দি খোলা পেরিয়ে আবার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটা। চোখে পড়ল বড় বড় গাছের গায়ে আটকে থাকা বিশালাকার ছত্রাক। হলুদ রঙের একরকম ফুলের গাছে আলো হয়ে রয়েছে জঙ্গল। সাড়ে ন'টা নাগাদ তালিগ্রায় চা-পানের বিরতি। এগারটা নাগাদ সালাগারিতে পৌঁছে দুপুরের খাওয়া সারা হল। আবার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চড়াই ভেঙ্গে এগোনো। বেলা দুটোর সময় ইটালিয়ান বেস ক্যাম্প পৌঁছলাম।

বিকেল থেকেই শুরু হল তুষারপাত - টানা তিনদিন থামার কোন লক্ষণই নেই। এরমধ্যেই বেস ক্যাম্প চত্বরে ঘুরে স্মৃতিফলকগুলো দেখছিলাম - এই অভিযানে এসে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদেরই স্মৃতিতে। মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল।





জাতীয় পতাকা প্রদান অনুষ্ঠান

২৬ এপ্রিল, শনিবার - অপেক্ষায় অপেক্ষায় এক সপ্তাহ কেটে গেছে। শেরপারা বারতুয়েক বেসক্যাম্প ঘুরে এলেও আমরা রওনা হতে পারিনি। আজ সকাল ছ'টা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে চড়াই ভেঙ্গে বেশ কিছুটা ওপরে ওঠার পর আবার নীচে নামার পালা। সোজা নেমে যেতে হবে একেবারে ছোনবর্ন হিমবাহের বুকে। খাড়া বরফের ঢালে লাগানো দড়ি ধরে সন্তর্পনে নামা। হিমবাহের বুকের ওপর দিয়ে সাবধানে চলা - পেরোলাম সুইস বেসক্যাম্প। এবারে দুপাশের খাড়া পাথুরে ঢালের মধ্য দিয়ে পথ। খুব সাবধানে দ্রুত রক ফল জোন পেরোলাম। জাপানি বেসক্যাম্পে পৌঁছে প্যাক লাঞ্চ খুলে খাওয়ার পাট সারা হল।

দুপুরের পর আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করল। হালকা তুষারপাতের মধ্যেই পৌঁছলাম বেসক্যাম্প। পাশাপাশি অনেক দলের তাঁরু পড়েছে - ফরাসি, জাপানি, পোলিশ, ইতালিয়ান ও স্পেনের অভিযাত্রীদের।

বেসক্যাম্পে পৌঁছেই হাওয়ার দাপট টের পেলাম। ধৌলাগিরি বিখ্যাত বা ক্যুথাত এই হাওয়ার জন্যই। উত্তরে তিব্বতের দিক থেকে একটানা বয়ে চলে এই হাওয়া। তীব্র হাওয়ার দাপটে পাহাড়, মাটি ক্রমাগত ক্ষয় হয়ে তৈরি হয়েছে প্রকৃতি সৃষ্ট ভাঙ্কর্য। এইজন্যই টুকুচে শৃঙ্গের দেওয়ালে আঁচড়ের মতন লম্বালম্বি দাগ রয়েছে।

বেস ক্যাম্পের দক্ষিণে ধৌলাগিরি। মাঝে ছোনবর্ন হিমবাহ। হিমবাহের পরেই পিরামিডের আকারে যে কালো খাড়া পাথুরে শৃঙ্গ দাঁড়িয়ে রয়েছে, বিখ্যাত আইগার (IGAR) শৃঙ্গের সঙ্গে তার সাদৃশ্য থাকায় এরও নাম রাখা হয়েছে আইগার। এরই গা বেয়ে আমাদের উঠতে হবে।

২৭ এপ্রিল, রবিবার - বেসক্যাম্প বা মূল শিবির গুছিয়ে নেওয়া শুরু হল। তৈরি হল মন্দির আর টয়লেট।

গত কয়েকদিন প্রচুর তুষারপাত হয়েছে। চারপাশের পাথরের দেওয়ালগুলোতে তুষার জমে রয়েছে। রোদ ওঠায় মাঝে মাঝেই ওই দেওয়ালগুলো থেকে আলগা বরফ গড়িয়ে পড়ে তুষারধ্বস বা অ্যাভালাঞ্চ-এর সৃষ্টি করছে।

এরমধ্যে ওপরের ক্যাম্প থেকে দুজন অভিযাত্রী আইগারের দেওয়াল বেয়ে নেমে এল - গা ঘামানোর পালা চলছে - প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা।

অনেক দল, অনেক লোকজন, তাই খাবারের লোভে এসে জুটেছে অসংখ্য পাখিও। রয়েছে অজস্র বাহারি প্রজাপতিও।

বেসক্যাম্পে পৌঁছে যাওয়া মানে অভিযানের প্রথম পর্ব শেষ। শেষপর্বের কঠিন দিনগুলোর আগে আপাতত কয়েকদিন সুবিধামত জমিয়ে খাওয়া, গল্পের বই পড়া, গান শোনা। ওরই ফাঁকে ফাঁকে চলছে ম্যাসেজ - শরীরটাকে ঝরঝরে করে নেওয়ার জন্য।

আবহাওয়া বেশ পরিষ্কার। কিন্তু একটানা হাওয়ার দাপট চলছেতো চলছেই। ধৌলাগিরির মাথার দিকে তাকালেই চোখে পড়ছে প্রবল হাওয়ায় বরফ মেঘ উড়ছে।

২৮ এপ্রিল, সোমবার - সকাল থেকেই শুরু হয়ে গেছে পূজোর প্রস্তুতি। পেছারাই পুরোহিত। পূজোর শেষে পেছা সকলকে খাদ্য পরিবেশ দিল, টাঙানো হল প্রেয়ার ফ্ল্যাগ। ইতিমধ্যে জার্মানির একটা বেশ বড় দল এসে হাজির।

৩০ এপ্রিল, বুধবার - চা-বিস্কুট খেয়ে রাত আড়াইটার সময় রওনা দিলাম একনম্বর ক্যাম্পের দিকে। শেরপারা গভকাল একবার একনম্বর ক্যাম্প থেকে ঘুরে এসেছে। হেড-টার্চের আলোয় পথ চলা। সামনে বসন্তদা আর পেছা, মাঝে আমি, পেছনে মলয়। দাওয়া আর পাসাং অনেকটাই এগিয়ে গেছে। ছোনবর্ন হিমবাহ আড়াআড়ি পার হয়ে আইগারের খাড়া দেওয়ালে জুমার লাগিয়ে চলা। একটানা খাড়া উঠে এরপর বাঁদিক বরাবর হালকা হালকা বরফের ঢাল। পথের বাঁপাশে আইসফল জোন। আইগারকে পেছনে ফেলে এরপর ডানদিকে ধৌলাগিরির দেওয়াল বেয়ে ওঠা।

ক্রমশঃ ভোর হল। সূর্যের আলো ধীরে ধীরে রাঙিয়ে দিচ্ছে ধৌলাগিরির শীর্ষ। পশ্চাৎপটে চাঁদ। অপূর্ব দৃশ্য। এবারে একের পর এক অন্য শৃঙ্গগুলোও প্রথম সূর্যের আলোয় সোনালি হয়ে উঠছে।

বকবকে আবহাওয়া। কিন্তু হাওয়ার দাপট অব্যাহত। বরফের ময়দান বরাবর এগিয়ে চলা। মাঝে মাঝে মার্কিং ফ্ল্যাগ দেখে অভিযুক্ত ঠিক করে নেওয়া। হিমবাহের মাঝখান দিয়ে ঢাল। তাই প্রচুর ক্রিভার্স বা ফাটল রয়েছে। চারপাশে আইস ফল জোন। ডানপাশে ধৌলাগিরির ঢালেও ছোট-বড় তুষারধ্বসের চিহ্ন। দড়ি লাগানো নেই। খুব সাবধানে একেবেকে পথ চলা। একটা লম্বা ঢাল পেরিয়ে পৌঁছলাম এক নম্বর শিবিরে। উচ্চতা ৫৮০০ মিটার। ঘড়িতে তখন সকাল দশটা চল্লিশ। আশেপাশে অন্যান্য দলের তাঁরু পড়েছে। তাঁরুর ঠিক পাশেই বরফের দেওয়াল। সেখান থেকে বরফ কেটে নিয়ে এল পেছা, পানীয় জল বানানো হবে। মাথা তুললে চোখে পড়ছে ধৌলাগিরির মাথায় তীব্র হাওয়ার দাপটে বরফ-মেঘের উড়ে যাওয়ার দৃশ্য। উত্তর-পূর্বে টুকুচে আর টুকুচে পশ্চিম। উত্তর পশ্চিমে ধৌলাগিরির অন্যান্য শৃঙ্গ।

১ মে, বৃহস্পতিবার - আজ গা ঘামানোর পালা। সকালে খালি হাতেই বেরিয়ে পড়লাম। ওপরে উঠতে উঠতে চোখে পড়ল ধৌলাগিরির পূর্ব গিরিশিরা। পূর্বদিকে বরফের ঢালের পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে অম্লপূর্ণা। উত্তর-পূর্বে টুকুচে,

উত্তরে সীতা চুচুরা। উত্তর থেকে পশ্চিমদিকে ধৌলাগিরির অন্যান্য শৃঙ্গ। আর দক্ষিণে স্বয়ং ধৌলাগিরি। সাড়ে দশটা নাগাদ ৬০০০ মিটারের মতন ওঠার পর আবার নীচে নামতে শুরু করলাম।



ক্যাম্প-১ এর পথে সূর্যোদয়



বেস ক্যাম্প

১ মে, বৃহস্পতিবার - আজ গা ঘামানোর পালা। সকালে খালি হাতেই বেরিয়ে পড়লাম। ওপরে উঠতে উঠতে চোখে পড়ল ধৌলাগিরির পূর্ব গিরিশিরা। পূর্বদিকে বরফের ঢালের পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে অম্লপূর্ণা। উত্তর-পূর্বে টুকুচে, উত্তরে সীতা চুচুরা। উত্তর থেকে পশ্চিমদিকে ধৌলাগিরির অন্যান্য শৃঙ্গ। আর দক্ষিণে স্বয়ং ধৌলাগিরি। সাড়ে দশটা নাগাদ ৬০০০ মিটারের মতন ওঠার পর আবার নীচে নামতে শুরু করলাম।

উত্তরে সীতা চুচুরা। উত্তর থেকে পশ্চিমদিকে ধৌলাগিরির অন্যান্য শৃঙ্গ। আর দক্ষিণে স্বয়ং ধৌলাগিরি। সাড়ে দশটা নাগাদ ৬০০০ মিটারের মতন ওঠার পর আবার নীচে নামতে শুরু করলাম।

বিকেল থেকে শুরু হল হালকা তুষারপাত। ক্রমে জোর বাড়তে থাকল। ঘন মেঘের চাদরে ঢেকে গেল চারপাশ।

২ মে, শুক্রবার - সকাল থেকেই মেঘলা। হালকা তুষারপাতও চলছে। তারমধ্যেই আটটা নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়লাম - গন্তব্য ক্যাম্প- টু। একটানা তুষারপাতের জন্য আগের অভিযাত্রীদের পায়ের চিহ্নও কোথাও নেই। প্রতি পদক্ষেপে পা ডুবে যাচ্ছে বরফে, চলতেও বেশ কষ্ট হচ্ছে। মেঘলাতো ছিলই। ক্রমশঃ চারপাশ থেকে ঘন মেঘের চাদর এসে সবকিছুকে একেবারে ঢেকে দিল। আট-দশ ফুট দূরের কিছুও আর চোখে পড়ছে না। ওর মধ্যেই হেঁটে চলেছি। হাওয়া আর তুষারপাত দুটোই ক্রমশঃ তীব্র হচ্ছে। বেলা সাড়ে এগারটাতো ক্যাম্প টুতে পৌঁছতে পারলাম না দেখে চিন্তা হল যে রাস্তা ভুল করে ক্যাম্প পেরিয়ে চলে যাইনিতো? সকলে ঠিক করলাম সঙ্গে মালপত্র সেখানেই জড়ো করে রেখে আবার নীচে নেমে আসব। কিন্তু এত মেঘ, হাওয়া আর তুষারপাত যে ফেরার পথে রাস্তা পুরোপুরিই হারিয়ে ফেললাম। এদিকে সঙ্গে তাঁবু, স্টোভ কিছু নেই। শেষমেষ পেশ্বা ঠিক করল বরফ কেটে গুহা বানিয়ে তাতেই থাকা হবে। এদিকে বরফ কাটার বেলচাও নেই। অগত্যা কার্ডবোর্ডের একটা টুকরো নিয়ে ঝিনুক দিয়ে সাগর ছেঁচার মত গুহা বানানোর চেষ্টা শুরু করল। অনেকক্ষণের প্রাণান্তকর চেষ্টার পরও যখন বিশেষ এগোলনা তখন হাল ছেড়ে দিল পেশ্বা। এবারে পথ খোঁজার একটা শেষ চেষ্টা - একেবারেই মরিয়া আমরা। প্রায় দেড়-দু'ঘন্টা খোঁজার পর হঠাৎই মেঘের আড়াল সরে গিয়ে সকলের চোখে পড়ল একটা মার্কিং ফ্ল্যাগের আবছা উপস্থিতি। আহ, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম সকলেই। এবারে সেই ফ্ল্যাগের নিশানা দেখে দেখে ক্যাম্প ওয়ানের দিকে ফিরে চলা। পৌঁছলাম বিকেল সাড়ে পাঁচটায়।

৪ মে, রবিবার - সকাল সাড়ে আটটায় আবার রওনা ক্যাম্প টু-র দিকে। লক্ষ্য ধৌলাগিরির উত্তর-পূর্ব গিরিশিরা। আবহাওয়া একদম পরিষ্কার। তবে পূর্বদিক থেকে দলবঁধে উঠে আসছে মেঘের সারি। গতকাল মূল শিবির থেকে আরও কয়েকটা দল একনম্বর ক্যাম্পে পৌঁছেছিল। আজ তারাও আমাদের সঙ্গী।

ধীরে ধীরে মেঘলা হয়ে এল, শুরু হল তুষারপাত। তার মধ্যেই এগিয়ে চলা। খাড়া ঢাল বেয়ে প্রথমে ওপরে উঠে তারপর দড়ি ধরে অন্য ঢাল বরাবর বাঁদিকে নেমে বেলা একটা নাগাদ ক্যাম্প টুতে পৌঁছলাম। উচ্চতা ৬৪০০ মিটার। আগামীকাল আবার বেস ক্যাম্পে নেমে যাব।

১০ মে, শনিবার - সকাল আটটা নাগাদ খালি হাতেই রওনা দিলাম ফ্রেঞ্চ পাস অভিমুখে। এর আগে বেশ কয়েকদিন বেস ক্যাম্পেই শেরপা আর অন্যান্য অভিযাত্রীদের সঙ্গে গল্পে-আড্ডায় কাটল। যাওয়ার পথে ধৌলাগিরি আরোহণ করতে এসে যাঁরা মারা গেছেন তাঁদের স্মরণ করে নির্মিত স্মৃতিফলকগুলো চোখে পড়ল। একের পর এক স্মৃতিফলক দেখতে দেখতে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছিল।

ছোনবর্ন গ্লেসিয়ার পেরিয়ে খাড়া উঠে এলাম একটা গিরিশিয়ার মাথায়। ঝকঝকে আবহাওয়া। পিছনে তাকালেই চোখে পড়ছে বিশাল ধৌলাগিরি। এরপর গিরিশিয়ার মাথা বরাবর চলা। গিরিশিরা পেরিয়ে হালকা ঢালের লম্বা বরফের ময়দান।

সাড়ে এগারোটা নাগাদ উঠে এলাম ৫৩৬০ মিটার উচ্চতায় ফ্রেঞ্চ পাসের মাথায়। পাসের দক্ষিণে ধৌলাগিরি, দক্ষিণ-পশ্চিমে টুকুচে, উত্তর দিকে মুকুট হিমাল। পাসের একদম মাথায় চলছে একটানা ঝোড়ো হাওয়া।



সি - ৩ থেকে দেখা অন্নপূর্ণা, নীলগিরি



শিখরের কাছ থেকে দেখা টুকুচে ও অন্যান্য শৃঙ্গ

চিহ্ন চোখে পড়ল। না খেমে প্রবল হাওয়ার মধ্যেই এগোতে থাকলাম। হাওয়ার দাপটে বরফের কুচি উড়ে এসে চোখেমুখে পড়ছে। মনে হচ্ছে যেন টুকরো পাথর এসে লাগছে। বিকেল চারটে নাগাদ উঠে এলাম ৭২৫০ মিটার উচ্চতায় ক্যাম্প থ্রিতে।

২২ মে, বুধবার - রাত দশটা-সাড়ে দশটা নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়লাম সামিটের জন্য। কমতে কমতে দলটা এখন বেশ ছোট। আমরা তিনজন আর সঙ্গে তিন শেরপা আর স্পেনের দুজন সঙ্গে এক শেরপা। ঘন্টা দুয়েকে পৌঁছলাম প্রায় ২০ মিটার উঁচুতে লাগানো জাপানি তাঁবুর কাছে। এখান থেকে আমাদের সঙ্গী হল এক জাপানি মহিলা ও তার দুই শেরপা। পথে আসতে আসতে আমাদের সঙ্গী মলয়ের কিছু অসুবিধা হওয়ায় সিদ্ধান্ত হল ও এই জাপানি মহিলার তাঁবুতেই থেকে যাবে। অন্যান্য বছরের থেকে আমাদের যা অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা হল সারারাত আমরা ক্লাইম্ব করে ভোরবেলায় মাথায় চড়ে যাব। এখানেও লক্ষ্য তাই ছিল। ৮১৬৭ মিটার উচ্চতায় উঠতে হবে। আর আমরা প্রায় ৭২৫০ মিটার থেকে যাচ্ছি। বাকী দূরত্ব প্রায় ৯০০ মিটারের কাছাকাছি। তারমানে পাহাড়ে ন'ঘন্টাতো লাগবেই, আমরা ধরে নিয়েছিলাম দশ থেকে বারো ঘন্টা লাগবে। মোটামুটি পরদিন সকাল আটটা-সাড়ে আটটা নাগাদ আমাদের ক্লাইম্ব করার কথা।

২৫ মে, শনিবার - গত কয়েকদিন ডায়েরি লেখার মতো অবস্থা ছিল না। বাইশ তারিখের ঘটনা থেকেই শুরু করি -

কখনও বরফের ঢাল, কখনওবা পাথরের, তারই মধ্যে দিয়ে উঠে যাওয়া। চারপাশের সব শৃঙ্গগুলো অনেক নীচে। অনেকটা পশ্চিমদিকে করে এসেছি বলে অল্পপূর্ণা ধৌলাগিরির ঢালের আড়ালে চলে গেছে। পিছনে টুকুচের পাশ দিয়ে ফ্রেঞ্চ পাস দেখা যাচ্ছে। যখন বেরিয়েছিলাম তখন হাওয়া ছিল না। কিন্তু পথে যেতে যেতে মাঝে মাঝেই বেশ জোরালো হাওয়া দিচ্ছে আর তাতে বরফ উড়ছে। চলতে চলতে বারবারই দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। ফলে যেখানে সকাল আটটা-সাড়ে আটটায় পৌঁছানোর লক্ষ্য ছিল, সেখানে বিকেল আড়াইটে-তিনটেতেও আমরা পৌঁছাতে পারিনি। খাওয়া নেই, জল নেই, শরীর ক্লান্ত, এদিকে প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছে - সমস্তকিছুই ক্রমশঃ আমাদের প্রতিকূলে চলে যাচ্ছে। একবার হাওয়া বন্ধ হচ্ছে, হাঁটা শুরু করছি, আবার হাওয়া বইছে, আমরা বসে পড়ছি। এভাবেই এগোতে এগোতে অনেক বেলা হয়ে গেছে।

এইভাবে চলে বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ পৌঁছে গেলাম চূড়ার ঠিক নীচের ধাপে। তখন আর হয়তো ৫০-৬০ মিটার বাকী, ঘন্টাখানেকের মত পথ। আমরা একসঙ্গে একটা দড়িতেই যাচ্ছিলাম - আমি, বসন্তদা, পাসাং আর পেশ্বা শেরপা। এটাকে রোপ আপ করা বলে। আমাদের ঠিক আগে আগে যাচ্ছিল ওই জাপানি মহিলা আর তার দুই শেরপা। তার সামনে ছিল একজন স্প্যানিশ গারার নাম, আর তার শেরপা কেশব। আমাদের পেছনে ছিল আরেকজন স্প্যানিশ - লোলো - ওদের টিমলিডার। হঠাৎ করে এইসময় কেশব পড়ে গেল। আমরা তখন ফিল্ম রোপ করিনি, কারণ দড়ি অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, ফ্রি ক্লাইম্ব করছিলাম। কেশব বই পড়ল, ওর সঙ্গে রোপ আপ করে থাকায় গারার পড়ে গেল। তবে নরম বরফ থাকায় ওরা একশো-দেড়শো ফিট নীচে গিয়েই

বেলা দুটো নাগাদ বেসক্যাম্পে ফিরে এলাম।

১৯ মে, রবিবার - গত সপ্তাহখানেক ধরেই আবহাওয়ার কোন উন্নতি না হওয়ায় একটানা বেসক্যাম্পেই থাকতে হয়েছে। এদিকে বর্ষাও এসে যাচ্ছে। কয়েকটা দলতো হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরেই গেল। আমরা বেশ মরিয়া হয়েই ভোরবেলায় বেরিয়ে ঘন্টা আটেক হাঁটার পর পৌঁছে গেলাম ক্যাম্প ওয়ান।

২১ মে, মঙ্গলবার - সকাল সাড়ে ছটায় বেরিয়ে পড়লাম ক্যাম্প থ্রি-র উদ্দেশ্যে। সকালের ঝকঝকে আবহাওয়ায় খাড়া ঢাল ধরে উঠে যাওয়া। পূর্বদিকে তাকালেই দেখতে পাচ্ছি অল্পপূর্ণা আর নীলগিরি। পশ্চিমদিকে ধৌলাগিরির বিভিন্ন শৃঙ্গ। উত্তরে টুকুচে। আমাদের আগে পরে আরও কয়েকজন অভিযাত্রী-শেরপা রয়েছে। বেলা যতই বাড়ছে হাওয়ার বেগও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে, সঙ্গে বরফের কুচিও উড়ছে।

বেলা দুটো নাগাদ একজায়গায় পৌঁছে জাপানি তাঁবুর

আটকে যায়। আমাদের শেরপা পেঙ্গা বলল, অ্যাক্সিডেন্ট শুরু হো গিয়া, চলো ওয়াপাস চলতে হায়া। আমরা নামতে শুরু করলাম। কিছুটা নামবার পর একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে পাসাংকে বললাম, দেখ ওদের কিছু সাহায্য করতে পার কীনা। যদিও জানতাম হয়তো সম্ভব হবে না। সঙ্গে দড়ি নেই, কোন ইকুইপমেন্ট নেই। খানিকক্ষণ পর পাসাং ফিরে চলে এল। হাওয়াতে ওর সানগ্লাস উড়ে চলে গেছে, ও খানিক ভয় পেয়ে নেমে এসেছে। এদিকে প্রবল হাওয়াতে আমার সানগ্লাসের ওপর বরফ উড়ে এসে জমে কঠিন হয়ে যাচ্ছে, কিছু দেখা যাচ্ছে না। মেঘলা হয়ে আছে, রোদের তেজ নেই দেখে সানগ্লাস খুলেই হাঁটছি। কিন্তু প্রচণ্ড হাওয়ায় চোখে এফেক্ট করছে। ঝাপসা দেখতে দেখতে সন্দের দিকে অন্ধ হয়ে গেলাম - আর দেখতে পাচ্ছি না। বসন্তদার হেডটর্চের আলোটা জোরালো ছিল। বসন্তদার সঙ্গে আলোটা বদলে নিলাম। দড়িটাকে এবার কেটে নিলাম। একটা দড়িতে আমি আর পেঙ্গা আর আরেকটা দড়িতে বসন্তদা আর পাসাং। আমার অক্সিজেন তখন শেষ হয়ে গেছে। অক্সিজেন সিলিন্ডার, স্যাক সব দড়িতে বেঁধে নামতে শুরু করলাম। কিন্তু চোখে না দেখতে পাওয়ায় আমি বুঝতেই পারিনি যে যেখানটায় আমরা আলাদা হলাম সেখানে বসন্তদা বসে গেছে। আমার মাথায় তখন একটাই ভাবনা যে ওই জাপানি মহিলার তাঁরুটা যেখানে ছিল, আমাদের তাঁরুর দ্রুশো মিটার ওপরে, সেখানে পৌঁছাতে হবে। হাঁটছিতো হাঁটছি। তারপর কোন একসময় সেখানে পৌঁছালাম। পেঙ্গা বলল, দেবাশিসদা পৌঁছ গিয়া। তাঁরুতে ঢুকে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। মনে হল যেন মারাই যাচ্ছি, চোখের সামনে নানান রঙ দেখছি। তাঁরুর ভেতরে কেউ আমাকে টেনে নিল, আমার মনে হল বোধহয় বসন্তদা। আসলে জাপানি মহিলার একজন শেরপা ছিল দাওয়া, সেই আমাকে টেনে নিয়েছিল। কেউ একটা গরম কোনো তরল আমাকে খাইয়ে দিল। প্রায় ঘন্টাটুকু ওভাবে আচ্ছন্ন অবস্থায় চোখ বন্ধ করে শুয়ে ছিলাম। তারপর আস্তে আস্তে চোখ খুললাম। তখন আবছা আবছা আলো দেখতে পাচ্ছি। তখন খেয়াল করলাম বসন্তদা নেই। পেঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করলাম বসন্তদা কোথায়। বলল, বসন্তদাতো উপর রহ গিয়া, উসকো জিন্দা আনা মুসকিল হায়া।



শিখরের পথে, শেষ চূড়া দেখা যাচ্ছে



শেরপারা বসন্তদাকে নামিয়ে আনছে

পেঙ্গা এর মধ্যে ওয়াকিটকিতে আমাদের তাঁরুতে যোগাযোগ করেছিল। ওখানে তখন মলয় আর ওর সঙ্গে শেরপা দাওয়া ছিল। দাওয়াকে মলয়ের অক্সিজেন সিলিন্ডার আর একটু জল বানিয়ে ওপরে বসন্তদার কাছে যত সকালে সম্ভব পৌঁছাতে বলেছিল। পাসাং ততক্ষণে নেমে এসেছে, দাওয়া বসন্তদার কাছে পৌঁছে গেছে। ওখান থেকে ওয়াকিটকিতে জানিয়েছে, বসন্তদা মিলগয়া, ও ঠিক হায়া, লেकिन চল নেহি সক্তা। আমি তখন বসন্তদার সঙ্গে কথা বললাম - তোমার বাড়িতে বৌদি আছে, ছেলে আছে, ওদের কথা ভাব, মনে জোর আনো, উঠে দাঁড়াও। বসন্তদা তখন একটাই কথা বলছে, আমাকে পিঠে করে নামাতে হবে। কিন্তু ষাট-পঁয়ষট্টি কেজির একজনকে পিঠে করে নামানো সম্ভব নয়। সে কথা বলতে বসন্তদা বলল, তুই তো নেমে গেছিস। বুঝতে পারছি আমি নেমে এসেছি, বসন্তদা পারছে না, এরকম মনে হতেই পারে। আমি অনেক করে বোঝালাম। দাওয়ার সঙ্গেও কথা বললাম যে আমরা যেভাবে নেমে এসেছি, সেভাবে নেমে এস। তারপর এক দেড়ঘন্টা হয়ে গেছে। তখনও কেউ ফিরছে না দেখে বার বার ফোন করছি কিন্তু কেউ ফোন ধরছে না। আমি আর পেঙ্গা দুজনেই তখন মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেছি যে

নিশ্চয় বসন্তদাকে পিঠে করে আনতে গিয়ে দাওয়া পা স্লিপ করে দুজনেই পড়ে গেছে। তখন আমার মন পুরোপুরি ভেঙ্গে গেছে - একসঙ্গে এলাম, বসন্তদাকে নিয়ে ফিরে যেতে পারব না। চোখে জল চলে এসেছে। তখনও আর কেউই ফেরেনি, সেটাও খুব খারাপ লাগছে। বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ বসে থাকতে থাকতে বিমুনির মত হয়েছিল, পেঙ্গা ডেকে বলল, দেবাশিসদা, বসন্তদা আ গয়া। তাকিয়ে দেখি দাওয়া ঠেলে বসন্তদাকে টেস্টে ঢোকাচ্ছে। তখন আমি দাওয়াকে এই মারিতো সেই মারি - তুমি ওয়াকিটকি ধরছনা। দাওয়া বলল বসন্তদাকে প্রায় পিঠে করে এনেছে তাই ফোন ধরার অবস্থা ছিল না।

এরপর বসন্তদা সেরিব্রাল ইডিয়ার মত একটা অবস্থায় চলে গেল - ভুল বকছে, ঠিকমত চিনতে পারছে না, রাগ করছে, যা খুশি বলে যাচ্ছে। পরদিন শেরপাদের বললাম, তোমরা যেভাবে হোক বেঁধে বসন্তদাকে নামাও, আমি নীচে চলে যাচ্ছি। আমি থাকলে বসন্তদা কথা শুনবে না। মিনিট পনেরোয় আমি দ্রুশো মিটার নীচে তাঁরুতে নেমে গেলাম। বসন্তদাকে ওই দ্রুশো মিটার নামাতে প্রায় দেড়-দুঘন্টা লাগল। ধাক্কা খেতে খেতে নামায় খুব আহতও হল, হাঁটুর মাংস ছিড়ে গেল। আমার মনে হল যে এভাবে নামাতে গেলেতো পথেই মারা যাবে। শেরপাদের বললাম যে যত ম্যাট্রেস আছে, সব দিয়ে পৌঁচিয়ে বাঁধ। যখন প্রায় বাঁধা শেষ তখন দেখি একটা হেলিকপ্টার আসছে। নীচে একটা হুক ঝুলছে। ওরা এসেছিল ওই স্প্যানিশ লোকটির খোঁজে। কিন্তু হুক ঝুলছে দেখে আমরা বসন্তদাকে আটকে দিলাম। ওরা প্রথমে বেসক্যাম্প নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বসন্তদার হিল ডায়ারিয়া হয়ে গিয়েছিল। তাই আর রিস্ক না নিয়ে সোজা কাঠমাড়ুতে নামিয়ে নিয়ে আসে।



উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার

সত্যি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম - বসন্তদাকে বাঁচাতে পারব।

এরপর ক্যাম্প ত্রি গুটিয়ে প্রায় দেড়টা নাগাদ নামতে শুরু করলাম। বেলা প্রায় সাড়ে চারটে নাগাদ ক্যাম্প টুতে পৌঁছে গেলাম।

২৮ মে, মঙ্গলবার - কলকাতায় পৌঁছে ডায়েরির শেষ পাতাটা লিখতে বসেছি। ২৬ তারিখে সকালেই বেরিয়ে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই এক নম্বর ক্যাম্পে পৌঁছে গেলাম। চা-বিস্কুট খেয়ে আবার নীচে নামা। আইগারের কাছের সেই লম্বা বরফের ময়দান থেকে হেলিকপ্টার আমাদের তুলে নিয়ে বেসক্যাম্পে

নামিয়ে দিল। ফিরে আসতে পারলনা সেই জাপানি মহিলা কোনো, স্পেনীয় গারা আর জাপানি মহিলার অন্য শেরপা দাওয়া। মনখারাপ নিয়েই পরেরদিন হেলিকপ্টারে নেমে এলাম পোখরা পর্যন্ত। সেখান থেকে প্লেনে কাঠমাণ্ডু। কাঠমাণ্ডু থেকে কলকাতা। অবশেষে একটা অসমাপ্ত আরোহণের সমাপ্তি হল।



ফ্রেঞ্চ পাস থেকে দেখা ধৌলাগিরি

~ [ধৌলাগিরি পর্বতাভিযানের আরো ছবি](#) ~

ইনকাম ট্যাক্স অফিসার দেবশীষের ভালোলাগা-ভালোবাসার সবটুকুই পাহাড়কে ঘিরে। ১৯৯৭ থেকে তাঁর পাহাড়চূড়ার অভিযান শুরু হয়েছিল। মাউন্ট কামেট, শিব, শিবলিঙ্গ, পানওয়ালিদর, রুবাল কাং - এই পাঁচ শিখর ছোঁয়ার পর বসন্ত সিংহ রায়ের সঙ্গে যৌথভাবে প্রথম অসামরিক বাঙালি পর্বতারোহী হিসেবে ২০১০ সালে এভারেস্টের শিখর আরোহণ। এরপর ২০১১-য় প্রথম অসামরিক ভারতীয় পর্বতারোহী হিসেবে বসন্ত সিংহ রায়ের সঙ্গে যৌথভাবে কাম্বনজঙ্জার শিখর ছোঁয়া। এরপর ২০১২-য় মাউন্ট অন্নপূর্ণা জয়।



কেমন লাগল :

Like Be the first of your friends to like this.

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

[আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন](#)



বেড়ানোর কথা
আর ছবি নিয়ে
বাংলা
ই-মগাজিন

আমাদের বাঁধনা

আমাদের দেশ

আমাদের পৃথিবী

আমাদের কথা

G

Q

= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আ. র্গাল ত্রমপত্রিকা'য় আপনাকে স্বাগত আনাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল :

সুন্দরী নায়াগ্রা

সুচেতনা মুখোপাধ্যায় চক্রবর্তী

~ নায়াগ্রার তথ্য ~ নায়াগ্রার আরো ছবি ~

সকাল আটটা বাজার আগেই ট্যুরিস্ট বাসে উঠে সাত তাড়াতাড়ি নিজের সিটে গিয়ে বসলাম - টানটান উত্তেজনা আর ঘন ঘন ঘড়ি দেখা অন্যদের আসার অপেক্ষায়। একে একে সকলে চলে এল, কিন্তু গন্তব্যস্থলটি এতটাই আকর্ষণীয় যে আমার আর তর সহিছিল না - ওয়ার্ল্ড ডেস্টিনেশন - নায়াগ্রা জলপ্রপাত। ওয়াশিংটন ডি. সি. থেকে নায়াগ্রা যেতে সময় লাগবে আটঘন্টা। মাঝে দু'একটা ব্রেক। বাস চলতে শুরু করতেই ট্যুরিস্ট গাইড গ্যাবি-র মাইক হাতে ঘোষণা - ভিক্টোরিয়া যদি বিশ্বের দীর্ঘতম হয়, তবে নায়াগ্রা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি আয়তনযুক্ত জলপ্রপাত। গ্যাবির কথা শুনতে শুনতেই বাইরে তাকিয়ে দেখি মসৃণ পিচের রাস্তা দিয়ে হু হু করে চলেছে আমাদের বাস। দুপাশে কখনও বাগানঘেরা সুন্দর কাঠের বাড়ির সারি, কখনও বা চাষের ক্ষেত। পথচলতি দু'একটা গাড়ি প্রায় ঝোড়ো হাওয়ার মত আমাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল। দুপুরে রাস্তার ধারে একটা রেস্টুরেন্টে স্যান্ডুইচ, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর কফি সহযোগে লাঞ্চ সেরে আবার পথ চলা।

পথের দু'ধারে গাছের সারি - মনে হল কোন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলেছি। সাইনবোর্ডে চোখ পড়তে দেখি - ক্যান্টোন ওয়াইল্ডলাইফ স্যান্ডুয়ারি। ছোট ছোট চেকপোস্ট, ফরেস্ট বাংলা পেরিয়ে তাযোগা নদীকে পাশে রেখে পেনসিলভেনিয়ার মেনরোডে পড়লাম। এবারে আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ ধরে গাড়ি চলেছে। বাঁপাশে রেলপথ আমাদের সঙ্গী। পাহাড়ের গায়ে সুন্দর ছোট ছোট বাংলা বাড়ি। ডানদিকে বয়ে চলেছে কোহকটন নদী। নদীর স্বচ্ছ জলে পাহাড়ের ছায়া পড়ে জায়গাটা অপূর্ব সুন্দর করে তুলেছে, ঠিক যেন ক্যালিভার্নের ছবি। রাস্তায় ছোট ছোট কেনু রিভার র‍্যাফটিং-এর জন্য রাখা আছে। আমাদের পাশ দিয়ে আরও কয়েকটা বাস আর গাড়িও চলেছে পাল্লা দিয়ে - সবার গন্তব্যই নায়াগ্রা।



© Nirmalya Chakraborty

নায়াগ্রা শহর পৌঁছাতে পৌঁছাতে পৌনে চারটে বাজল। কংক্রিটের ইমারত আর গাড়ির ভিড় সত্ত্বেও বেশ ছিমছাম শহর, নিউইয়র্ক স্টেটেরই অন্তর্ভুক্ত। বাস একটা ব্রিজে উঠল, ব্রিজের নীচে শান্তনীল জল সূর্যের আলোয় চকচক করছে। মাইকে গ্যাবির কণ্ঠও কানে এল - এটাই নায়াগ্রা নদী। নায়াগ্রা নদীকে পাশে রেখে কিছুক্ষণ নায়াগ্রা শহরের মধ্য দিয়ে চললাম। হঠাৎ দূরে কী যেন দেখে সবাই চোঁচিয়ে উঠল। দেখি সবার অবাক দৃষ্টি সেইদিকেই। চোখ পড়তে আমিও হতভম্ব হয়ে গেলাম। রাশি রাশি সাদা জলকণা আকাশ সমান উচ্চতায় উঠে আবার নীচে পড়ছে। কেউ কেউ ক্যামেরাবন্দী করছে সেই অসাধারণ দৃশ্য। বিস্মিত হয়ে প্রকৃতির এই অদ্ভুত খেলা দেখছি, কানে এল গ্যাবির গলা, ওইটা নায়াগ্রা জলপ্রপাতের একটা ছোট অংশ!

নরম সিল্কের মত বাঁ চকচকে রাস্তাটা গিয়ে পড়েছে গন্তব্যস্থলের একেবারে সামনে। জুলাই মাস - আমেরিকায় সামার। ছুটি কাটানোর মনের মত

জায়গা এই নায়াগ্রায় তাই অজস্র মানুষের ভিড়। গ্যাবি আমাদের অনুসরণ করতে বলে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। গ্যাবির পিছন পিছন আমরাও দাঁড়লাম বিশাল এক লাইনে। ভারতীয়-বিশেষি নানান মানুষের সঙ্গে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম লাইন ধরে। থামলাম একটা লিফটের সামনে। দশতলার সমান উচ্চতা থেকে লিফটে নামতে নামতেই এক পুরুষ কণ্ঠস্বর ভেসে এল - আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনারা পৌঁছে যাবেন বিখ্যাত ওয়ার্ল্ড ডেস্টিনেশন নায়াগ্রাতে। লিফট থেকে নেমে এগিয়ে চললাম - রাশি রাশি মানুষ - চরম একটা উত্তেজনা সকলের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে - কখন বোট আসবে, পৌঁছে যাব 'মেড অফ দ্য মিস্ট'-এর জগতে।

অবশেষে বোট এল। আঠেরশো লোক ধরে এই বোটে। নায়াগ্রা নদীর নীল জলের ওপর দিয়ে ভেসে চলল বোট। দূরে নায়াগ্রা জলপ্রপাত। যদিকেই তাকাই সাদা রাশি রাশি জল, বাঁদিক থেকে ডানদিকে গোল করে বিস্তৃত। ইরি লেকের জল প্রবলবেগে আছড়ে পড়ছে অন্টারিও লেকের মধ্যে। অপূর্ব তার সৌন্দর্য, অপরিসীম তার শক্তি। চারদিকে ছিটকে পড়ছে জলকণা।

তিনটি জলপ্রপাত নিয়ে নায়াগ্রার বিস্তার। বাঁদিকে আমেরিকান ফলস, মাঝখানে ব্রাইডাল ভেইল ফলস আর ডানদিকে হর্স ও ফলস। বোট প্রত্যেকটি ফলসের কাছেই যাবে। উত্তেজনা তখন শিরায় শিরায়। বাঁদিক ঘেঁষে বোট এগোলো। আমেরিকান ফলস-এর ছিটকে পড়া জলকণা ভিজিয়ে দিচ্ছে শরীর। উত্তেজনায় কেউ চিৎকার করছে, কেউবা ফেটে পড়ছে উল্লাসে। সূর্যের সোনালো আলো



© Nirmalya Chakraborty

জলপ্রপাতের গায়ে পড়ে বলসে দিচ্ছে চোখ। রামধনু তার সাত রঙ দিয়ে ঘিরে রেখেছে প্রকৃতির এই সুন্দরী রূপকে। আমেরিকান ফলস-এর সৌন্দর্য মনকে ছুঁয়ে যেতে না যেতেই বোট পৌঁছে গেল ব্রাইডাল ফলস-এর কাছে। এবারে একেবারেই ভিজে গেলাম আমরা। শুধু শরীরই নয়, যেন বিন্দু বিন্দু জলের ছোঁয়ায় ভিজে যাচ্ছিল মনও। এই অভাবনীয় অভিজ্ঞতার সাক্ষী হতে পেরে সত্যিই নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছিল। সবশেষে হর্স শু ফলস - বিশাল এই জলপ্রপাতের জল বড় বড় পাথরে ধাক্কা খেয়ে আকাশের দিকে ছিটকে যাচ্ছে ঠিক যেন সাদা ধোঁয়ার মত। ভয়ে অনেকেই একে অন্যকে জড়িয়ে ধরছে। জল যেখানে আছড়ে পড়ছে তার কাছাকাছি প্রচণ্ড স্রোত। সেখানে পৌঁছে দলতে দলতে হেলে পড়ছে বোট। প্রাণপনে আঁকড়ে ধরে থাকি রেলিংটা। দুলতে দুলতেই বোট ফেরার পথ ধরে। 'মেড অফ দ্য মিস্ট' ছাড়া আরও একটা রাইড আছে নায়াগ্রাতে 'কেড অফ দ্য উইন্ড'। গুহার ভেতর দিয়ে ব্রাইডাল ডেইল জলপ্রপাতের পিছনে পৌঁছে যাওয়া যায়। সেখানে আর গেলাম না। এতক্ষণ ধরে ঘোরাঘুরি করে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, সুন্দর একটা ঘাস বিছানো জায়গা দেখে বসে পড়লাম। অনেকে ইতিউতি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আশপাশে বেশ কয়েকটা স্যুভেনিরের দোকানও রয়েছে। কেউ কেউ নায়াগ্রার চারপাশে ঘুরে দেখার জন্য টুরিস্ট বাসে করে চলেছেন।

একটু পরে উঠে হাঁটতে হাঁটতে রেলিং-এর পাশে এসে দাঁড়ালাম। সেখানে অনেক মানুষের ভিড়। চারপাশ থেকে আলোর ফোকাস এখন সাদা বরনাকে রঙিন করে তুলেছে। লাল, নীল, হলুদ আলোর বন্যায় যেন সে সেজে উঠেছে রানির মতই। ঠিক যেন সুন্দরী মেয়েকে সিন্ধার দিয়ে সাজিয়ে করে তোলা হচ্ছে অপরাধী। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। ওরই মধ্যে আবার আর এক চমক। সাড়ে দশটা বাজতে না বাজতেই আকাশের গায়ে রঙিন বাজির বৃষ্টি - চারদিক রঙে রঙে ভরে উঠেছে যেন। কোনো বাজি আকাশে গিয়ে সোনালি ফুলের মত ছড়িয়ে পড়ছে, কোনোটা লাল ফুল, কোনোটা সবুজ। রাত এগারোটা পর্যন্ত আলোর বন্যায় ভেসে এবার ফেরার পালা। বাসস্ট্যাণ্ডে ফিরে দেখি গিটার নিয়ে গান করছেন একজন। তাঁর সুরের মুছনায় চারদিক আরও মোহময় হয়ে উঠেছে। গানের রেশ মেলাতে না মেলাতেই গ্যাংবি হাজির - আমাদের নায়াগ্রা অভিযান শেষ।



~ নায়াগ্রার তথ্য ~ নায়াগ্রার আরো ছবি ~



ভ্রমণ সাহিত্যচর্চায় আগ্রহী সচেতনতার প্রিয় বিষয় জঙ্গল। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর লেখায় পাহাড়, নদী, পশুপাখি আর অরণ্যের আদিবাসী জীবনের পাশাপাশি উঠে এসেছে শহুরে জীবনের বিচিত্রতাও। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'অরণ্য হে'।



কেমন লাগল :

Like Be the first of your friends to like this.

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

[আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন](#)



বেড়ানোর কথা
আর ছবি নিয়ে
বাংলা
ই-ম্যাগাজিন

আমাদের বাৎসরিক আয়োজন

G Q

= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আ. জাল ব্রমপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল =



বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে শেয়ার করতে চান কাছের মানুষদের সাথে - ঠিক তেমন করেই সেই কথাগুলো ছোট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। ছয় থেকে ছেয়টি আমরা সবাই এই ছুটির আড্ডার বন্ধু। লেখা [ডাকে বা নির্দিষ্ট ফর্মে](#) মেল করে পাঠালেই চলবে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com

প্রবারণা পূর্ণিমার রাতে

জিয়াউল হক শোভন

শহরের ভিতরে একটা উৎসবের আমেজ ছিলো। রাতের আকাশের দিকে হঠাৎ চোখ পড়তেই দেখি পুরো আকাশ রঙিন হয়ে আছে। উৎসবের সন্ধানে আশপাশে খোঁজ করতেই আমরা পৌঁছে গেলাম কল্লবাজার এর সবচেয়ে বড় ক্যাং-এ। ক্যাং হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপাসনাগার। স্যান্ডেল খুলে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করলাম। মন্দিরটি একটি টিলার উপর অবস্থিত। এলাকাটিও বেশ বড়। ভিতরে অনেকগুলো ছোট ছোট মন্দিরের সমাবেশ। সামনে বেশ বড় একটা খোলা জায়গা। সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছিল। অনেক মানুষের সমাগম। একটু খেয়াল করতেই আকাশ রঙিন হওয়ার রহস্য খুঁজে পেলাম। অনেক মানুষ - ছেলে-বুড়ো, পুরুষ-মহিলা - ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সবাই মহানন্দে শত শত ফানুস ওড়াচ্ছে।



সমুদ্র সৈকত ধরে যাঁটা

ছবি: মেহমুদ রনি

২০১১ সালে বান্দরবান অভিযান শেষ করে আমরা চলে যাই চকরিয়া আর্মি ক্যাম্প। রনি ভাইয়ের এক আত্মীয় সেখানকার আর্মি ক্যাপ্টেন ছিল। রাতটা কাটিয়ে পরদিন সকালে আর্মির গাড়ি নিয়ে যাই ফাসিয়াখালি অভয়ারণ্য দেখতে। সেখান থেকে তার পরেরদিন সকালে রওনা দিই কল্লবাজারের দিকে। কল্লবাজার পৌঁছেই সোজা চলে যাই সমুদ্র সৈকতে। সমুদ্রের ধারে কিছুক্ষণ কাটিয়ে, রাতে থাকার জন্য ঝাউবনে তাঁরু টাঙানোর জায়গা ঠিক করে করে খাওয়াদাওয়া সারতে ফিরে আসি শহরের ভিতরে। একটা জায়গায় দেখি ভ্যানের উপরে কাঁকড়া রান্না করে বিক্রি করছে। লোভ আর সামলাতে পারলাম না। পঞ্চাশ টাকা প্লেট কিন্ত স্বাদ অসাধারণ। তখনও আমরা জানতাম না যে সেদিন প্রবারণা পূর্ণিমার রাত। তারপরে হঠাৎই চোখে পড়ল আকাশজুড়ে ভেসে থাকা রঙিন রঙিন ফানুসগুলো।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের একটি প্রধান ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে প্রবারণা পূর্ণিমা। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বছর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে এই উৎসব পালন করেন। স্বর্গ থেকে গৌতম বুদ্ধের আগমন উপলক্ষেই মূলত এই দিনে

অনুষ্ঠানটি পালন করা হয়। প্রবারণার তিন মাস আগে থেকে ভাস্করা (বৌদ্ধ পুরোহিত) ক্যাং এর ভিতর স্বেচ্ছা নির্বাসন করেন। কল্লবাজারে মূলত রাখাইন সম্প্রদায় এই উৎসবটি অনেক বড় করে পালন করে। সাকরাইন, কঠিন চাঁবরদান, বিজু উৎসব, পানি খেলা ইত্যাদি জনপ্রিয় উৎসবের মতো প্রবারণা পূর্ণিমাও বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

আমরাও বেশ উৎসাহেই যোগ দিলাম ফানুস ওড়ানোর ছোট একটা দলে। বড়বড় চুল, উল্লুখুচু চেহারা, পিঠে ব্যাকপ্যাক, তাঁরু আর কোমরে স্যান্ডেল - এই অদ্ভুত মূর্তি দেখে অনেকেই আমাদের ফিরে ফিরে দেখছিলেন। উৎসবের ভিড়ে নিজেদের বেমানানও ঠেকছিল অবশ্য। এর মধ্যেই পরিচয় হলো এক রাখাইন পরিবারের সাথে। অনেকেই সপরিবারে উৎসবে এসেছেন ঢাকা ও বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গা থেকেও। ফানুস ওড়ানোর পাশাপাশি বিভিন্ন রাখাইন গান হচ্ছিল। ভাষা না বুঝলেও সুরটা খুব ভালো লাগছিলো। পরিবেশটা ছিল খুবই সুন্দর। রাখাইনরা অনেকেই মন্দিরে পূজা করছিলেন। বৌদ্ধমূর্তিকে খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। মন্দিরগুলোও উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছিল। সিঁড়ি দিয়ে সবচেয়ে ওপরের মন্দিরে চলে গেলাম। ভিড় আর কোলাহল দুইই এখানে কম। সমুদ্রের গর্জনও শোনা যাচ্ছিল। অনুষ্ঠান শেষ হোল প্রায় ১২ টার দিকে। ফানুস ওড়ানোও শেষ। সাগরের কোলে অনেক দূর পর্যন্ত আকাশে ভেসে যাচ্ছিল রঙিন ফানুসের দল।



ফানুস

ছবি: মেহমুদ রনি



বৌদ্ধ মূর্তি

ছবিঃ সোহনুদ রানি

সৈকতে ফিরে এসে তাঁরু টাঙালাম। একটু রাত হতেই নির্জন হয়ে গেলো বিস্তীর্ণ সাগরবেলা। তখনই দেখতে পেলাম সমুদ্রের আসল সৌন্দর্য। নির্জন সৈকতে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় হাঁটার কথা এতদিন গল্প উপন্যাসেই পড়েছিলাম, এবার নিজেরা অনুভব করলাম। পূর্ণিমার আলোয় সমুদ্রের অসামান্য রূপ উপভোগ করেই রাত্রি পার হয়ে গেলো। ভোরের আলো একটু ফুটতে একজন দৃজন করে মাছ ধরা জেলেরা বের হলো। তাঁরুতে ফিরে আমাদের চোখেও ঘুম নেমে এল।

~ কল্পবাজারের তথ্য ~

ভ্রমণপ্রেমী জিয়াউলের স্বপ্ন সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়ে প্রকৃতি আর বিভিন্ন ধরনের মানুষের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া।



কেমন লাগল : - select -

Like Be the first of your friends to like this.

te! a Friend f t M

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

অপরূপা সোমেশ্বরী

মার্জিয়া লিপি

সোমেশ্বরীর পাড়ে এসেই মনটা বাতাসে ভাসতে থাকে। নদী পাহাড়ের অপরূপ আরণ্যক সৌন্দর্যে বিমোহিত প্রকৃতি। মেঘ ঠেলে সূর্যের আলো এসে পড়েছে পাহাড়ে। স্নিগ্ধ নরম সোনালি রোদ। নদীর পাড়ে দাঁড়ালেই দেখা যায় ভারত সীমান্তের মেঘালয় রাজ্যের মেঘ ঢাকা গারো পাহাড়ের মনোরম দৃশ্য। নদীর দুপাশে বিস্তীর্ণ বালুতট। সোমেশ্বরীর একপাড়ে দুর্গাপুর অন্যপাড়ে বিরিশিরি। সুসং রাজ্যের গারো সভাপতি দুর্গার নাম থেকে এই এলাকার নামকরণ হয়েছে আর সোমেশ্বরীর নাম হয়েছে রাজার পাঠক সোমেশ্বরের নাম থেকে।

আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের ঐতিহাসিক পটভূমি দুর্গাপুর। উনিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশ দশকে মহাজনদের অমানবিক নির্যাতনের প্রতিবাদে মণিসিংহের নেতৃত্বে এখানে সংগঠিত হয় আদিবাসীদের টংক বিরোধী আন্দোলন। সেসময়ে বিদ্রোহী আদিবাসীদের লাল রঙে রঞ্জিত হয় সোমেশ্বরীর কাঁচের মত টলটলে নীল পানি। তাই এই নদীর সঙ্গে মিশে রয়েছে স্থানীয়দের বেদনার স্মৃতি।

পাড়ের কিনারায় এসে নৌকার অপেক্ষা। একপাশের বালুতটে সারাইয়ের অপেক্ষায় পড়ে আছে মাঝারি একটি নৌকা। খরস্রোতা সোমেশ্বরী। পাহাড়ের বরফ গলা স্বচ্ছ, শীতল ধারা। নদীর স্বচ্ছ পানির নীচে ছোটবড় পাথর, নুড়ি ভেসে চলছে। মহাশোল মাছের আবাসস্থল এই সোমেশ্বরী নদী। টলমলে পানির নীচে পাথরের গায়ের সবুজ শৈবাল খেয়ে বেঁচে থাকে মহাশোল মাছ। শিল্পীর প্রোব্রেটে আঁকা নীল রঙের সোমেশ্বরী। দূরে সবুজ পাহাড়, সাদা আসমানি নীল রঙের মিশেল আকাশে হেলান দিয়ে আছে। দেখে মনে হয়, যেন আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায়ে। সাদা মেঘগুলো পাহাড়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। নদীর একপাশ শীর্ষ। পায়ে হেঁটেই পাড় হলাম পাহাড়ি এই দস্যি নদী। বহু বছরের টগবগে যৌবন আজ অনেকটাই স্তিমিত। অবশ্য আষাঢ়-শ্রাবণে তীব্র জলজ উচ্ছ্বাস এসে ভরিয়ে দেয় সোমেশ্বরীকে, তখন তার অন্যরকম ভয়ঙ্কর রূপ। এক পাশে বিস্তীর্ণ বালুচর অন্যপাশে সোমেশ্বরী নদী সাপের গতিতে ঐক্যবৈক্যে বয়ে চলছে। ধু ধু বালু রোদে ঝিকমিক করছে। বিজয়পুর সীমান্তে ফাঁড়ির দিকে গন্তব্য, রিকসা চড়ে ১৯ জনের দল। ২-৩ জন করে বেশ কয়েকটি রিকসায় পাড়ি দিচ্ছি গ্রামের পথ। আঁকা বাক্স রাস্তা, বাঁশের ঝাড়, কোথাও ধানক্ষেত। রাস্তার মোড়ে বাঁশের টং-এ পান, বিড়ি, চা-এর বেসাতি।

কাছেই রাণিখং গির্জা। মা মেরীর আর যিশুর ছবির পাশেই পাথরে খোদাই করা আছে গির্জার ইতিহাস। প্রায় ১১০ বছরের পুরোনো এই গির্জা দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের টিলার ওপরে। রিকসা থেকে নেমে তানজিলের ক্যামেরায় গির্জায় মা মেরী আর যিশুর সাথে বিভিন্ন ভঙ্গিতে একের পর এক ছবি তুলে চলছে দলের প্রায় সকলেই। বিন্ময় জাগে, এত অজগায়ু শতবছরের পুরোনো ইট সিমেন্ট আর পাথরের স্মৃতি চিহ্ন দেখে।

সীমান্তে বিজয়পুর ফাঁড়ি যেখানে সাদা মাটি পাওয়া যায় সেদিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। পথের একপাশে লাল শাপলার শীতল স্নিগ্ধ পুকুর, পাড়ে নারকেল গাছের সারি। গারো পাহাড় ছাড়িয়ে আমরা চিনামাটির পাহাড়ের দেশে পৌঁছেছি। খানিক কাঁচা, খানিক পাকা রাস্তা, কখনও বাঁশঝাড়ের মাঝখান দিয়ে মাটির সরু পথ পেরিয়ে প্রায় আধঘন্টার রাস্তা শেষে দৃষ্টিসীমায় এবার সাদামাটির পাহাড়। শ্রমিকরা মাটি তুলছে - হালকা বিভিন্ন রঙের মিশেল মাটি আর তার থেকে



নেত্রকোণা

ছবিঃ মার্জিয়া লিপি



বিরিসি

ছবিঃ সালেক খোকন

আলাদা করে রাখছে সাদামাটি। কিছু মাটি কাগজে মুড়ে সুভেনির হিসেবে ব্যাগে রেখে এগিয়ে চলি স্থানীয় পুটিমারী বাজারে। পাশেই একটি সেমিনারি যেখানে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী ফাদারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ফিরে আসার তাড়া। তবে ফেরার আগে বাজারে সেরে নিলাম দেশি মুরগির ঝাল ঝোলে দুপুরের খাবার।

~ সোমেশ্বরীর তথ্য || সোমেশ্বরীর আরো ছবি ~



লেখিকা ও পরিবেশবিদ মার্জিয়া বাংলাদেশের জাতীয় স্তরে পরিবেশ পরামর্শক হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে কর্মরত রয়েছেন। কাজের সূত্রে এবং ভালোলাগার অনুভূতি নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন বাংলাদেশের আনাচেকানাচে। প্রকৃতি, মানুষ, সমাজ নিয়ে সেই অনুভূতির ছোঁয়াই ফুটে উঠেছে তাঁর কলমে। প্রকাশিত বই 'আমার মেয়েঃ আত্মজার সাথে কথাপকখন'।



কেমন লাগল :

Like Be the first of your friends to like this.



মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

জোনাকি পোকাকার দেশে

রফিকুল ইসলাম সাগর

ঈদের দু'দিন পর মনে হচ্ছিল কোথাও যাওয়া প্রয়োজন। তা না হলে ঈদই হবে না। আমার মন ঢাকায় আর এক মুহূর্তও থাকতে চাইছে না। মাথায় শুধু ঘুরপাক খাচ্ছে কোথায় যাওয়া যায় তার চিন্তা। রাতে বন্ধুদের সাথে আড্ডায় বসে সিদ্ধান্ত হলো আমার ফুপুর বাড়ি যাব - হরিয়াবহ গ্রাম। দুপুর সাড়ে বারোটায় ট্রেন। সকালে ঘুম ভেঙ্গে দেখি ঘড়ির কাঁটায় সাড়ে দশটা। দ্রুত বিছানা ছেড়ে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা না করেই বেরিয়ে পড়লাম। হাতে সময় খুব কম। এরই মধ্যে বন্ধুরা সবাই স্টেশনে পৌঁছে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। এদিকে তাড়াহুড়া, ওদিকে নির্বিকার রিক্সাচালক রিক্সা রাস্তার এক পাশে থামিয়ে একেকবার মোবাইল ফোনে কথা বলেই চলেছে। মহাখালী পর্যন্ত রিক্সায় গিয়ে তারপরে বাসে উঠলাম। ঈদের ছুটিতে ঢাকার পথ পুরো ফাঁকা ছিল। পথে গাড়ি আর মানুষ দুইয়েরই সংখ্যা বেশ কম। অন্য দিনের মত বাসের ভিতরে যাত্রীর চাপ নেই। খুব আরামেই অল্প সময়ে স্টেশনে পৌঁছালাম। মনে মনে ভাবলাম আমাদের ঢাকার রাস্তা যদি সব সময় এমন ফাঁকা থাকত।

আমি পৌঁছানোর পর বন্ধুরা নিশ্চিত হলো। এবার ট্রেন আসার অপেক্ষা। ঠিক টাইম মত সাড়ে বারোটাতোই স্টেশনে ট্রেন এসেছে। ব্যাপারটা আমাদের অবাক করল। টাইম মত ট্রেন আসা তো বিশাল বড় ভাগ্যের ব্যাপার। খুশি মনে উঠে পড়লাম ট্রেনে, চলতেও গুরু করল। গন্তব্য আজমপুর। ঘোড়াশাল স্টেশনে গিয়ে থামল ট্রেন। কী ব্যাপার এই স্টেশনে তো ট্রেন থামার কথা না, বলল মনিম। পর্যবেক্ষণ করতে ট্রেন থেকে নেমে জানতে পারি অপরপ্রান্ত থেকে আরেকটি ট্রেন আসছে। এভাবে জিনারদী, রায়পুরা ও আশুগঞ্জ মিলিয়ে চারবার ট্রেন থামল। আড়াই ঘন্টার পথ আজমপুর পৌঁছাতে সময় লাগলো সাড়ে তিন ঘন্টা। যাওয়ার পথে ট্রেন থেকে দেখা দৃশ্যগুলো খুব উপভোগ করেছি। ঘোড়াশাল ও তৈরব দু'টি বড় ব্রিজ। রেলপথের দু'পাশের নদীগুলো বর্ষার পানিতে কানায় কানায় পূর্ণ। ট্রেন থেকে নেমে খানিকটা হেঁটে একটি সিএনজি অটোরিক্সায় উঠে পড়লাম পাঁচ বন্ধুতে। গাড়ি চলল হরিয়াবহ গাঁয়ের পথের দিকে।

হরিয়াবহ বলতে গেলে একেবারে অজপাড়াগাঁ। বিবাড়ীয়া জেলার কসবা থানার ছোট্ট একটি গ্রাম, কিন্তু সৌন্দর্যে অপরূপ। পাশেই ভারতের সীমান্ত। হরিয়াবহ গ্রামে এখনও পুরোপুরি বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। সরাসরি কোনও বাস যায়না।

সড়ক পথে ঢাকা থেকে যেতে অনেক সময় লাগে তাই রেলপথ ব্যবহার করে অধিকাংশ মানুষ। এখানকার বেশিরভাগ পুরুষ চাকুরিজীবী। কিছু পুরুষেরা চাকরির জন্য ঢাকা ন্যূনতো চট্টগ্রামে থাকেন। কেউবা পাড়ি জমিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে। আর বাকিরা গ্রামে কৃষি কাজ করেন। বলা যায় এই গ্রামে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যাই বেশি। পাহাড়ি এলাকা। হরিয়াবহ গ্রামের বিয়েতে এখনো পালকির প্রচলন রয়েছে। ইমামবাড়ি রেল স্টেশনের সামনে পালকি ভাড়া দেওয়া হয়।



ঘোড়াশাল ব্রিজ

ছবিঃ রফিকুল ইসলাম সাগর

তবে দিনদিন পালকির কদর কমে যাচ্ছে। ছোটবেলায় অসংখ্য পালকি দেখতাম। তখন পালকি ছিল বিয়ের পর বউ নিয়ে যাওয়ার এক মাত্র মাধ্যম। এখন আর আগের মতো পালকি নেই।



দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ধানক্ষেত

ছবিঃ রফিকুল ইসলাম সাগর

চণ্ডিদার বাজার এসে অটো রিক্সা থামল। একে একে সবাই নেমে যার যার ব্যাগ কাঁধে নিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। বাজারের মানুষগুলো আমাদের দিকে কেমন যেন অবাধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। ঢাকা থেকে কেউ এলে বাজারের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় সবাই তাকিয়ে থাকে। কেউ কেউ আমাদের প্রশ্ন করল আপনারা কোন বাড়িতে যাবেন? হরিয়াবহ গ্রামের পাশেই চণ্ডিদার সীমান্ত। চণ্ডিদার বাজারের ভেতর দিয়েই গ্রামে যাওয়ার পথ। পাশেই একটি প্রাইমারি স্কুল। অন্যপথে হাইস্কুল। প্রাইমারি স্কুলের পাশ দিয়ে গাঁয়ে যাওয়ার রাস্তায় ঢুকলাম। কখনও সবুজ ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে আঁকা-বাঁকা মাটির রাস্তা, কখনও পুকুরের পাশ দিয়ে। এভাবে অবশেষে পৌঁছলাম ফুফুর বাড়ি। খাবার খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে বাজারের দিকে গেলাম। বাজারে এখন অনেক দোকান হয়েছে, সবকিছুই পাওয়া যায়। নতুন একটি হাসপাতাল হয়েছে। এখানের মিস্তি খুবই সুস্বাদু। কিন্তু চায়ের দোকানে চা খেয়ে স্বাদ পাওয়া যায় না। 'বরা' আর মিস্তি বিকেলের নাস্তা করলাম। পিঁয়াজির মতো দেখতে ছোট ছোট তেলে ভাজা এক প্রকারের খাবার পাওয়া যায়, স্থানীয় নাম 'বরা', খেতে খুবই ভালো। 'বরা' বিক্রি হয় পাল্লা পাথর দিয়ে

মেপে কেজি করে। তারপর হাই স্কুলের সামনের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকি। স্কুলটি অনেক বছরের পুরনো। হাঁটতে হাঁটতে একটু সামনে গিয়ে বড় একটি পুকুরের পাড়ে বসে খানিকক্ষণ মাছের লাফালাফি দেখলাম। এখানের মূল আকর্ষণ হলো সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলেই লক্ষ লক্ষ জোনাকি পোকা পুরো গ্রামটিকে আলোকিত করে তোলে। তখন একটি গান খুব মনে পরে 'জোনাকির আলো নিভে আর জলে শাল মহুয়ার বনে'। সত্যি, এই একটি দৃশ্য আমাকে বারবার এই গ্রামে টেনে আনে। বন্ধুরা সবাই খুব অবাধ হয় এত সুন্দর দৃশ্য দেখতে পেয়ে। মনে পড়ে ছোট বেলায় এখানে বেড়াতে এলে জোনাকি পোকা ধরে বোতলের মধ্যে আটকিয়ে রাখতাম।

পরেরদিন সকালে নাস্তা সেরে আমরা গোসল করতে দারোগা বাড়ির পুকুর ঘাটে গেলাম। গ্রামের আরো অনেকেই এই পুকুর ঘাটে গোসল করতে এসেছে। দীর্ঘ সময় পুকুরে ডুব দিলাম, ভেসে থাকলাম, সাঁতার কাটলাম। তারপর চণ্ডিদার সীমান্তের পাহাড়ি এলাকায় বেড়াতে গেলাম। যাওয়ার পথে রাস্তার দু'পাশে অনেক কাঁঠাল গাছ চোখে পড়ল। বেশ উঁচু পাহাড়। সবগুলো পাহাড়ে কাঁঠালের বাগান। এ যেন কাঁঠালের দেশ। পাহাড়ের ওপর মাটির ঘরে মানুষের বসবাস। ওপরে ওঠার জন্য সিঁড়ি কাটা আছে। দূর দূরান্তে দেখা যায় উঁচু উঁচু পাহাড়, বড় বড় গাছ। যার বেশির ভাগ অংশ ভারতের সীমান্তের ভিতরে। আশেপাশের গ্রামগুলো খুব শান্ত চারিদিকে সবুজ ধান ক্ষেত, শাক সবজির বাগান। সন্ধ্যা সাতটায় ঢাকা ফেরার ট্রেন। পড়ন্ত বিকেলে গাঁয়ের সবুজ পরিবেশ চোখে নিয়ে আর বিষুদ্ধ বাতাস শরীরে লাগিয়ে অটো রিক্সায় চড়ে রেল স্টেশনের দিকে ফিরে চলা। গাছে গাছে পাখিদের কিচির মিচির। ফিরে যাচ্ছি বলে মনটা কেমন জানি আবেগী হয়ে গেল। ট্রেনে উঠলাম। তারপর আবার সেই ব্যস্ত শহর।



পেশায় সাংবাদিক রফিকুলের বাড়ি বাংলাদেশে। জাতীয় দৈনিক পত্রিকার ফান ম্যাগাজিনে রম্য লেখার মধ্য দিয়ে লেখালেখির শুরু। বর্তমানে অনলাইন ভিত্তিক কার্টুন ম্যাগাজিন টুনস ম্যাগ বাংলা সম্পাদনা সহ বেশ কিছু জাতীয় পত্রিকায় নিয়মিত কলাম ধরেন। পাশাপাশি যুক্ত রয়েছেন নানান সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনের সাথে। ভ্রমণ, আড্ডা ও ছবি তোলা তাঁর পছন্দের বিষয়।



কেমন লাগল :

Like Be the first of your friends to like this.

te! a Friend

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00